নবেন্দু ঘোষ

দি গ্লোব লাইব্রেরী
২নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

আমার বড়দা নরেশচন্দ্র ঘোষের

করকমলে—

মুক্তি চাই

ঘরের ভিতর কে যেন চলাফেরা করছে !

শিবানীর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। রাত শেষ হয়ে এসেছে, আব্ছা আলোর ঢেউ এসে রাতের অন্ধকারকে হালকা করে তুলেছে।

"কেরে, কমল নাকি ?" শিবানী প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ, মা।"

"কি করছিস এই শীতে উঠে ?"

"জুতো হাতড়ে বেড়াচ্ছি।"

"কেন, কোথায় যাবি ?"

"কাজে।"

"কি কাজ এত ভোরে শুনি ?"

"আজ যে ২৬শে জানুয়ারী—স্বাধীনতা দিবস।"

"তা এখনই কি ?"

"প্রভাতফেরী বেরুবে, তারপরে মিছিল।"

"ওঃ"—শিবানী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। কিছু বলার নেই আর। ছেলেকে আটকান যাবে না, সে তা জানে—তাছাড়া আটকাবে কি জন্যে ? শিবানী তো যে সে লোকের বৌ নয়। অজয় সেনের বৌ সে—বিপ্লবী দলের একজন নেতা, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত রাজবন্দী অজয় সেনের বৌ সে। দেশকে না ভালবাসলে যে স্বামীকে অস্বীকার করা হয়। আর দেশকে যে ভালবাসে সে ত স্বাধীনতাও চায়। তাছাড়া স্বামীর জন্যই শুধু নয়—দেশকে ভালবাসার সংস্কার শিবানীর রক্তের মধ্যেই আছে।

ছেলের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

শিবানী উঠে বসল।

বাহাত্তর বছরের বুড়ী শাশুড়ী তখনও ঘুমোচ্ছেন। তাদের ঘরেই তিনি শোন। রোগজীর্ণা, শীর্ণকায়া বৃদ্ধা। চোখে কম দেখেন আজকাল, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না, বেশী চলতে পারেন না। দেখে কষ্ট হয়। ওদিকে অন্ধকার দ্রুতবেগে তরল হয়ে আসছে, শীতের কুয়াসা ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছে।

ইংরেজী ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসের কথা মনে পড়ে। তখন তাদের বয়স কত? স্বামীর বয়স তখন পঁচিশ, এম-এ পাশ করে ল' পড়ছে। শিবানীর বয়স উনিশ, তার খোকন ঐ কমল তখন দেড় বছরের ছেলে। বছর খানেক আগে শ্বশুর মারা গেছেন কিছু সঞ্চিত অর্থ রেখে। ভাসুর পৈত্রিক ব্যবসা ওকালতী আরম্ভ করেছেন, স্বামীও সেই পথেই জীবিকার্জ্জন করবে স্থির হয়েছে।

কিন্তু সেদিন সেই সকালে হঠাৎ অজয় বলল, "শিবানী, শোন।"

"কি?"

"তুমি কি দেশকে ভালবাস?"

"বাসি।"

"বেশ। এবার বলত, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা কি একজনের কাজ?"

"না তো।"

"আমাদের সবার তার জন্য চেষ্টা করা উচিত নয় কি?"

"নিশ্চয়ই।"

"তবে শোন শিবানী"—শিবানীর স্বামী বলল, "দারিদ্র্য আর অভাবই আমি তোমায় উপহার দেব। বুঝতে পারছ না? শোন, আমি স্বদেশী দলে যোগ দিয়েছি—আজ থেকে আর পড়তে যাব না। যতটুকু লেখাপড়ার দরকার ছিল, তা হয়েছে আমার।"

শিবানী ক্ষনকাল চুপ করে থেকে পরে মাথা নাড়ল, "আচ্ছা।"

ঐ বৃদ্ধা শাশুড়ীও পরে সেকথা শুনে বললেন, "আচ্ছা।" কিন্তু ভাসুর শুনে বলল, "না, এ মূর্খতা। জীবন নষ্ট করো না।"

শাশুড়ী বললেন, "হোক তাই। তুই আমায় বুঝবি না। স্বদেশ সেবার পথে আমার একটা ছেলে যদি জীবন নষ্ট করে তবে আমার জীবন ধন্য হবে। তাছাড়া বৌমাও মত দিয়েছেন।"

সেই শাশুড়ী বার্দ্ধক্যভারে অসহায়ের মত পড়ে আজ এখন ঘুমোচ্ছেন। তখন কিন্তু তাঁর অন্য রূপ ছিল। তেজমণ্ডিত মুখ-চোখ, আগুনের মত গায়ের রং তাঁর প্রৌঢ়ত্বেও অম্লান ছিল। দেশভক্তির সংস্কার ঐ মায়ের কাছ থেকেই তার স্বামী পেয়েছিল।

একঘণ্টা কেটে গেল।

না, ভোর হয়ে গেছে।

শাশুড়ী উঠেছেন। বিছানায় বসে শ্রীকৃষ্ণের একশ' আট নাম আবৃত্তি করছেন মৃদুকণ্ঠে। নিত্যকার অভ্যাস।

বাড়ীর আর কেউ জাগে নি এখনো, তার আগেই উনুনটা ধরাতে হবে। একটু পরেই ভীড় করে সব আসবে। স্কুল আছে, কাছারী আছে। অনেক কাজ।

উনুনের গাঢ় ধোঁয়ার মতই অতীতটা যেন একটা কুণ্ডলায়িত ধোঁয়ার পুঞ্জ। রান্নাঘরের মেজেটা ধু'লো শিবানী, বাসনগুলো এনে কোণায় রাখলো, ঝাড়ুটা নিয়ে বারান্দা ও নিজের ঘরটা ঝাড়ু দিলো।

শাশুড়ী জিজ্ঞেস করলেন, "বড় বৌমা ওঠেনি মা?"

"না, মা।"

"হুঁ।"

শাশুড়ী কথাও কম বলেন আজকাল।

বড় বৌমা মানে শিবানীর জা যশোদা, তার ভাসুর বিনয়বাবুর বৌ, সুজাতা, মণ্টু, নণ্টু ও বেবীর মা। রোগা মেয়েলোক, হাঁপানীতে ভুগে

ভুগে খিট্‌খিটে হয়ে গেছে। স্বভাবতঃ সন্দিগ্ধমনা, অলস। অসুখের ছুতোয় কাজকর্ম্মে বড় একটা হাত দেয় না। সেটা পুষিয়ে নেয় অকারণ চেঁচামেচি করে, শিবানীর উপর, স্বামীর উপর তম্বি করে। থাক্ বাবা, যশোদাদি' ঘুমিয়েই থাক্।

"বন্দে মাতরম্।"

চম্‌কে উঠল শিবানী। সর্ব্বনেশে মন্ত্র, মানুষ পাগল-করা মন্ত্র ঐ 'বন্দে মাতরম্'। ও মন্ত্রের ক্ষমতার পরিচয় শিবানী পেয়েছে। তার ভয় করে, বুক কেঁপে ওঠে ওই মন্ত্র ধ্বনিত হলে।

ফটকের দরজাটা একটু ফাঁক করে দাঁড়াল শিবানী।

"বন্দে মাতরম্।"

একদল লোক ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা ও নানা ইস্তাহার নিয়ে যাচ্ছে রাজপথ দিয়ে। ছেলে, বুড়ো, সবাই আছে।

"মহাত্মা গান্ধী কি জয়।"

"স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।"

"রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাও।"

হায় মূর্খেরা! চেঁচালেই কি মুক্তি পাওয়া যায়?

মিছিল কাছে এল। ওকি, কমল না? হ্যাঁ, তাই বটে। ত্রিবর্ণ পতাকাটির পাশে পাশে সে চলছে। সামনের দিকে তার স্থির দৃষ্টি প্রসারিত। যেন ভবিষ্যতের দিকে।

শিবানী দেখতে পেল যে, কমলও চেঁচাল—"বন্দে মাতরম্।"

মিছিল চলে গেল। শত শত লোকের পায়ের আওয়াজ শিবানীর মাথায় তখনও প্রতিধ্বনি তুলছে। শতকণ্ঠের চীৎকারধ্বনি তার কানের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কের বিচিত্র কক্ষের শক্ত দেয়ালগুলোতে তখনও মাথা খুঁড়ছে।

রান্না ঘর।

যশোদার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সুজাতার এক বছরের মেয়েটা কাঁদছে।

"ওলো খুকু—ও খুকু—মেয়ে কাঁদছে যে।"

উনুনের ধোঁয়া পাৎলা হয়ে এসেছে। সেই ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে ১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিলের মধ্যাহ্নটা মনে পড়ছে শিবানীর। কংগ্রেস স্বাধীনতা পাবার জন্য যে দাবী করেছিল তাকে সাম্রাজ্যবাদী কর্ত্তারা ছোট ছেলের বায়না মনে করে কানে তুলল না বলে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। সেই ৬ই এপ্রিলেই তা আরম্ভ হল।

সহস্র লোকের উন্মত্ত জনতা ঐ রাস্তা ধরে সেদিনও ছুটে গিয়েছিল।

"বন্দে মাতরম্"—সেই জনতা বলেছিল। আজকেরই মত।

"স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।" তারাও দাবী করেছিল।

"মহাত্মা গান্ধী কি জয়।" অতিমানব দেশনেতার জয়ধ্বনি তারাও তুলেছিল ঠিক আজকেরই মত।

অজয়ও ছিল সেই মিছিলে। খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, গান্ধী-টুপী মাথায় পরা, সুদর্শন যুবক। রোদ্দুরের তেজে তার গৌরবর্ণ সিঁদূরের মত হয়ে গেছে, ঘামে মুখ চকচক করছে, উত্তেজনায় চোখ ঝকঝক করছে শান-দেওয়া তলোয়ারের মত।

"বন্দে মাতরম্"—অজয়ও সেদিন চীৎকার করে বলেছিল। ঠিক ঐ কমলের মত। তারও দৃষ্টি সেদিন ছিল সামনের দিকে। যেমন কমলের ছিল আজ। পিতার রক্তের সঙ্গে সামনের দিকে তাকিয়ে 'বন্দে মাতরম্' বলার সংস্কারটাই সে পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে। ধন নয়, সম্পদ নয়, শুধু ঐ। কিন্তু কি দেখে ওরা সামনের দিকে তাকিয়ে? কি স্বপ্ন আগুনের মত জ্বলে ওদের চোখে? স্বাধীনতা? কিন্তু কৈ, শৃঙ্খল তো ঝনঝন শব্দে ভাঙ্গে না, কারাগারের দেওয়ালগুলো তো তবু ধূলো হয়ে আকাশে

মাকে প্রণাম করে অজয় একবার সকলের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপরে জেল হল অজয়ের। এক বছরের জন্য।

খবর শুনে শিবানী হাঁফ ছেড়েছিল। মাত্র এক বছর। কষ্টেসৃষ্টে কাটিয়ে দেবে সে। ঠিক কাটিয়ে দেবে।

চায়ের জল টগবগ করে ফুটছে।

ছেলেমেয়েরা উঠোনে এসে মুখ ধুতে বসেছে।

মণ্টুর বয়েস পনেরো, ফার্স্ট ক্লাসে পড়ছে, সে এসে হাঁক দিল—"কাকীমা, চা ?"

"এই হল বাবা"—জলের মধ্যে চায়ের পাতা ছেড়ে দিল শিবানী।

সুজাতা এসে হাজির হলো মেয়ে কোলে করে।

"চা হল কাকীমা ?"

"এই যে মা—"

একটা পেন্‌সিল নিয়ে আট বছরের নণ্টু আর পাঁচ বছরের বেবীতে মারামারি বেধে গেছে।

"মাগো—মা"—বেবী কেঁদে ডাক ছাড়ল।

"চুপ রাক্ষুসী কোথাকার"—নণ্টু ধমকাল।

যশোদার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "সকাল থেকেই চিড়িয়াখানার জানোয়ারেরা মারামারি শুরু করলি—উঃ মাগো, তোদের নিয়ে আর পারি না।"

বিনয়বাবুর হাঁক শোনা গেল, "নণ্ট, এদিকে আয়, না তো কান ছিঁড়ে ফেলব।"

চা তৈরী হয়েছে। সুজাতা আর মণ্টু ছোঁ মেরে দু'কাপ তুলে নিল।

শাশুড়ী মুখহাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ঘরের কোণে বসে জপ করছেন। কাপড় মানে একটা ছেঁড়া গরদের ধুতি।

"দাদা কই, কাকীমা ?"

"বেরিয়েছে।"

"কোথায় ?"

"আজকে যে ২৬শে জানুয়ারী।"

নণ্টু বুঝল না কথাটা।

সুজাতা বুঝল, বলল, "হতভাগা একদিন জেলে যাবে এবার।"

ভাসুর আর যশোদাকে চা দিয়ে এল শিবানী।

জেল! হ্যাঁ, কমলও জেলে যাবে বৈকি। যাক্ না, শিবানীর তাতে ভয় নেই। শিবানী জানে যে ও একটা দুর্লঙ্ঘ্য বিধিলিপি।

ছেলেমেয়ে ভাসুর আর শাশুড়ীকে জল খাবার দিতে হবে। যশোদা বলে যে, ওসব শিবানীর মত সে মোটেই করতে পারে না, তার মাথা গরম হয়ে ওঠে।

মুড়ি মুড়কী দিয়ে ছেলেমেয়েদের বিদেয় করে আটা নিয়ে বসল শিবানী। লুচি ভাজতে হবে ভাসুর আর শাশুড়ীর জন্য। যশোদাও দু' একটা খাবে বৈকি। কমলটা কোথায় ঘুরছে ? পাগল ছেলেটা না খেয়ে কতক্ষণ ঘুরবে ?

জেল! কবে শিবানী স্বামীকে দেখেছে শেষবার ?

দেড় বছর হল। তখন অজয় আলিপুর জেলে এসেছে। প্রায় তিন বছর পর দেখা হয়েছিল। বার বার যখন তখন দেখা হবে কি করে ? ভাসুর একসঙ্গে এতগুলো টাকা খরচ করতে রাজী নন, তাছাড়া সামর্থ্যেও কুলোয় না। ওকালতী ত আর চলে না, কেবল বাইরের ঘর আর ভিতরের ঘর। পৈতৃক সম্পত্তির জেরটাই জোর করে টানা হচ্ছে। গেল বার কমলকে নিয়ে শাশুড়ীও সঙ্গে গিয়েছিলেন ঐ অথর্ব্ব শরীর নিয়ে ছেলেকে দেখতে। টাকা তিনিই দিয়েছিলেন—তাঁর এক মরা মেয়ের আংটী বিক্রি করে ত্রিশটা টাকা যোগাড় করে। আর দেখা

কল্পার সুযোগও ত' আগে ছিল না। ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত অজয় তো আন্দামানেই ছিল। আন্দামান কেন? সে ইতিহাস পরে হবে।

মনে পড়ছে সেই ছবিটা। ছবি না তো কি? কিন্তু এ ছবি কোন্ চিত্রকর আঁকবে? স্ত্রীদেহ আর পৌরাণিক নরনারী ছাড়া আর যে ছবির বিষয়বস্তু পাওয়া যায় না আমাদের দেশে।

ছোট একটা ঘর। দরজার বাইরে বন্দুকধারী শান্ত্রী।

মাকে প্রণাম করল অজয়।

অজয়ের মা ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে চুপ করে কাঁদল শুধু। একটি কথাও বলল না।

মুখ ফিরিয়ে কমলের দিকে চেয়ে হাসল অজয় "কি খোকন, কি রকম আছিস?"

কমলের চোখও বুঝি ছলছল করছিল? কি জানি। সে বলল, "আমি খোকন নই বাবা, আমি কমল সেন।"

অজয় হেসেছিল, পরে মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, "শোন কমল, আমার সাধনায় সিদ্ধি না হলে সে সাধনাকে তোমায়ও তুলে নিতে হবে। স্ত্রী-পুত্র, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, মা-বাপ, সুখ আর সংসার তোমার জন্য নয় বাবা— মনে রেখো তুমি একজন সৈনিক।"

কমল বলেছিল, "জানি।"

আর পাঁচ মিনিট সময় ছিল।

অজয় তাকাল শিবানীর দিকে।

শিবানীর চোখে জল, মুখে মৃদু হাসি।

অজয় বলল, "বড় রোগা হয়ে গেছ যে!"

শিবানী বলল, "আর তুমি?"

সত্যি কি চেহারা সে দেখে এসেছে স্বামীর! মনে পড়লে কেঁপে ওঠে শিবানী। রোগা হলদে হয়ে গেছে অজয়, শরীরে যেন রক্তের লেশ নেই।

শুনেছিল যে প্রায়ই জ্বরে পড়ত। এখন কেমন আছে সে? ওগো, কেমন আছ তুমি, কেমন আছ? ভাল থাক গো, ভগবান তোমায় সুস্থ রাখুন।

লুচি ভাজা শেষ হল।

বিনয়বাবু খেয়ে দপ্তর ঘরে গেল।

শিবানী শাশুড়ীকে ডাকল, "মা।"

শাশুড়ী তাকালেন।

"খাও।"

শাশুড়ী বললেন, "আজ শুক্রবার ১২ই মাঘ, আমার অজয়ের জন্মদিন। এখন আমি খাব না মা, একটু ঠাকুরকে ডাকব বসে বসে।"

ঠিকই ত। লজ্জা হল শিবানীর। এত কথা ভাবছে অথচ ও কথাটা মনে ছিল না তার?

"শিবানী"—ডাকল যশোদা।

"যাই দিদি।"

যশোদা বলল, "লুচি কি এক আধটা আছে নাকি রে?"

"আছে ভাই, তোমার জন্য রেখেছি। খাবে এসো।"

"একটা দিস—তাহলেই হবে।"

খেতে খেতে যশোদা বলল, "তুই খাবি না? আয়—"

"না দিদি, এখন না।"

যশোদা খেয়ে চলে গেল। ডাল নামাল শিবানী, তরকারী চাপিয়ে চাল ধুতে বসল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই স্কুল-কাছারীর হিড়িক পড়বে।

কয়লার উনুন গন্‌গন্ করছে। তরকারী থেকে বাষ্প উঠছে। সূক্ষ্ম বাষ্প। চাল ধুয়ে সেদিকে তাকায় শিবানী। আগুন গন্‌গন্ করছে। মনে পড়ে।

১৯৩০ সালে দেশে যে সর্ব্বগ্রাসী আগুন জ্বলেছিল তার টুকরো টুকরো ছবি ভেসে যায়। কত লোক গ্রেপ্তার হল, আবার ছাড়া পেল। কিন্তু

সে আগুনের দাহ্যশক্তি শাসকদের পোড়াতে পারল না, যারা আগুন জ্বালিয়েছিল তারাই তাতে পুড়ে মরল।

১৯৩১ সালের জুন মাসে অজয়ও ফিরে এলো জেল থেকে। বড় গম্ভীর, দিনরাত কি ভাবছে। দেশে আন্দোলন তখনো চলছে বটে কিন্তু বেগ একটু স্তিমিত হয়েছে। নৈরাশ্য-জোয়ারের কালো জলে সবাই তখন নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। ফলে সন্ত্রাসবাদের ঢেউ এখানে ওখানে নিষ্ফল আক্রোশে সাম্রাজ্যবাদের শিলাস্তূপে আঘাত করছে মাঝে মাঝে।

"কি ভাব এত ?" শিবানী একদিন জিজ্ঞেস করল।

"কিছু না।" অজয় বলল।

তারপর থেকেই তাকে বাড়ীতে থাকতে দেখা যেত না বেশী। দিনরাত বাইরে বাইরে ঘুরত, অনেক রাতে বাড়ী ফিরত। মাস ছয়েক কাটল। এর মধ্যে পুলিশ এসে একবার বাড়ী তল্লাস করে গেল। এমনি সন্দেহ।

বিনয়বাবু একদিন বলল, "তোমায় এ পথ ছাড়তে হবে অজয়।"

অজয় মাথা নাড়ল, "না।"

সে মাকে বলল, "মা, তুমি কি বল ?"

মা বললেন, "তোর বিবেক কি বলে বাবা ?"

"বিবেক বলে, এ প্রাণ তুচ্ছ। জননী আর জন্মভূমি প্রাণের চেয়ে বড়।"

"তোর বিবেক যে আমারি বিবেক অজয়।"

"তবে কোনদিন দুঃখ করো না মা।"

অজয়ের পথ খোলা হয়ে গেল।

একদিন সারারাত শিবানী বসে রইল। অজয় ফিরল না। বলেছিল, দেরী হবে ফিরতে, কিন্তু সে যে এত দেরী তা সে ভাবে নি। পরদিনও কেটে গিয়ে রাত হলো।

মাঝরাতে শিবানীর তন্দ্রা ভেঙ্গে একটা শব্দ ভেসে এলো। কে যেন উঠোনে লাফিয়ে পড়ল।

"শিবানী"—সিঁড়ির উপর চাপা গলায় ডাক শোনা গেল।

"খুলছি"—অজয় এসেছে।

ঘরের ভিতর ঢুকেই অজয় তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল। বন্ধ করেই বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। তখন শিবানী লক্ষ্য করল কি ব্যাপার। অজয়ের বাঁ-হাতের কনুয়ের কাছটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, কাপড় চোপড়েও তার দাগ।

"কি হয়েছে এঁ্যা!"—শিবানী শিউরে কাছে এল।

"বলছি, তার আগে আইডিন এনে ভাল করে একটা ব্যাণ্ডেজ করে দাও তো।"

রক্তপড়া থামিয়ে ব্যাণ্ডেজ করল শিবানী। আধ ইঞ্চি পরিমাণ একটা ক্ষত, বেশ গভীর মনে হল। তার চারদিকে পোড়া পোড়া দাগ আর থেঁৎলে যাওয়ার চিহ্ন।

"কি হয়েছে বল এবার।" শিবানী থরথর করে কাঁপছে।

"শুনবে?"

"হ্যাঁ।"

"বোমা তৈরী করছিলাম, মশলা ঠাসবার সময় একটা ফেটে গিয়ে লেগেছে—ঠিক ভাবে লাগেনি তাই বেঁচেছি।"

শিবানী স্তম্ভিত হয়ে গেল। খানিক পরে সে বলল, "তুমি না অহিংসবাদী?"

"ছিলাম, এখন নই। ছিলাম, যেহেতু তখন ঐটেই উপায় মনে হয়েছিল। এখন নই কারণ অহিংসা দিয়ে স্বাধীনতা লাভ হয় না মনে হচ্ছে। হিংসা আর অহিংসায় কি যায় আসে শিবানী, দেশ ত আর ঈশ্বরের মত সূক্ষ্ম ব্যাপার নয় যে সূক্ষ্ম, আধ্যাত্মিক সাধন-মার্গ চাই তাকে উদ্ধার করার জন্য। দেশ বড় বাস্তব বস্তু, তাই দেশোদ্ধারের পথও বাস্তব হওয়া চাই। অহিংসার ধৈর্য্য আমাতে নেই—কারুরই মধ্যে নেই শিবানী।"

"তাহলে এই পথেই দেশোদ্ধার হবে ভাবছ ?"

"হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে—কি যায় আসে ? আমরা চেষ্টা করছি। নূতন নূতনভাবে বার বার চেষ্টা করব—একদিন হবেই।"

শিবানী চুপ করে রইল।

অজয় বলল, "কাল হয়ত পুলিশ আসবে, এখুনি সবাইকে জানিয়ে রাখ যে পা পিছলে বোতলের উপর পড়ে কনুইয়ে আঘাত পেয়েছি আমি —আর হ্যাঁ, আজ আমি বাড়ীতেই ছিলাম এটাও যেন সবাই মনে রাখে।"

শিবানী বসেই রইল।

অজয় হেসে বলল, "তোমাকে দুঃখই শুধু উপার্জ্জন করে দেব শিবানী—তাছাড়া আমার উপায় নেই। শোন শিবানী—যদি জেলে যাই বা ফাঁসি যাই কোনদিন—"

"না না, ও কথা বলো না।" শিবানী লুটিয়ে পড়ল অজয়ের পায়ের উপর।···

ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে দিল শিবানী। সত্যি বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। দেশ বড় বাস্তব বস্তু। জীবন বড় বাস্তব সত্য। নইলে এত দুঃখ এত চিন্তা সত্ত্বেও নিয়মিত ভাতের হাঁড়ি উনুনে চাপাতে হয়, খেতে হয়, খাওয়াতে হয়।

গোয়ালা দুধ নিয়ে এসেছে। শিবানী মেপে রাখল। দু'সের দুধ—ছোট বাচ্চাদেরই কুলোয় না। তাছাড়া শাশুড়ী আর ভাসুর আছে, যশোদাও আছে। কমলকে দিতে পারে না এক ফোঁটাও—বেদনায় শিবানীর বুক টন্‌টন্ করতে থাকে। ওর কি অভাব ঘটত কখনো ? স্বামী কি সাধারণ মানুষের মত উপার্জ্জন করে আনতে পারত না ? এমনিভাবে পরানুগ্রহে জীবন কাটাতে কে চায় ?

মাঝে মাঝে লুকিয়ে, চুরি করে একটু দুধ দিলেও কমল খায় না। ছেলেটা যে কি রকম! ওর ঠাকুরমা মাঝে মাঝে জোর করে, কেঁদেকেটে নিজের ভাগ থেকে একটু একটু খাওয়ায়। বেশী জোর করলে ঐ সতের বছরের ছেলেটাই সাত বছরের ছেলের মত রাগ করে, অভিমান করে, কথা বলে না। কে বলবে যে ও ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ছে।

কলসীতে জল নেই। জল ভরে নিয়ে আসল শিবানী। বাড়ীতেই কল আছে এই রক্ষে, নইলে এই দাসী চাকরহীন বাড়ীতে যে কি বিপদটাই হত।

ভাতের ফ্যান গেলে বেগুন ভাজতে বসল শিবানী। তারপরে দুধ জ্বাল দেবে। ছেলেমেয়েরা সবাই চান কর্তে এসেছে কলতলায়।

মণ্টু আর নণ্টুতে ধাক্কাধাক্কি বেধে গেছে।

"এই শূয়ার ঠেলছিস কেন?" মণ্টু বলল।

"ঠেলছি কোথায়, চান করব।" নণ্টু বলল।

বেবী বলল, "আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে দাদা—হটো ওদিকে।"

"যা যা—উ-হু-হু—কি শীত রে বাবা—"

"আমি তবে চান করবো না।" নণ্টু বলল।

বিনয়বাবু হাঁকলেন, "তাড়াতাড়ি আয়রে তোরা, আজ আমাদের গাড়ী ঠিক দশটায় আসবে।"

ভাজা নামিয়ে দুধ চাপাল শিবানী। আসন পীড়ি পেতে, গেলাসে জল ভরে একপাশে রেখে থালায় ভাত বাড়তে আরম্ভ করল। দুধ নামাতে হবে। শিবানী উঠল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই হুড়মুড় করে সবাই রান্নাঘর ভরে তুলল।

সুজাতা এসে বলল, "কাকীমা, আমার মেয়ের দুধ? হতচ্ছাড়ী আর পারছে না।"

"এই নে মা"—একবাটি দুধ এগিয়ে দিল শিবানী।

"ভাত দ্যাও কাকীমা"—মণ্ট বলল।

"দিচ্ছি বাবা"—

"কাকীমা—শিগ্‌গীর"—নণ্টু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল।

"বোস্ বাবা।"

"ও কাকীমা—কাকীমা-গো—আমাদের দাই এসে পড়বে যে"—বেবী মিনতি জানাল।

"এই যে লক্ষ্মী-মা—দিচ্ছি।"

বিনয়বাবু এলেন। পাখা নিয়ে এসে এক পাশে বসল যশোদা। গরম ভাত, একটু হাওয়া না করলে যে চলে না।

কেউ বোঝে না, কিন্তু যশোদা জানে যে এই হাওয়া করাটা কি কঠিন। স্বামি-ভক্তির কি জাজ্বল্যমান নিদর্শন এই কাজটা।

শীতের দিনেও শিবানী ঘামে ভিজে একাকার হয়ে যায়।

এমনভাবে হাওয়া দিচ্ছে যশোদা যে একটা মাছিও সে হাওয়া টের পাবে না। বেশী জোরে হাওয়া দিলে শীত করবে যে।

আধ ঘণ্টা পরে খাওয়া দাওয়ার পালা সব সাঙ্গ হল। ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেল, বিনয়বাবু কাছারীতে গেল। এঁটো বাসন পাঁজা করে কলতলায় নিয়ে গেল শিবানী। এখনো অনেক কাজ। কমল কখন আসবে? এখন এসব সেরে চান করতে হবে। গৃহদেবতার পূজো করতে হবে, শাশুড়ীকে খাওয়াতে হবে, নিজে খাবে। তারপরে আর এক পালা বাসন-মাজা আর রান্না ঘর ধোয়া। তারপরে একটু বিশ্রাম। বিশ্রাম নয়, রাবণের চিতায় ফুঁ দিয়ে দিয়ে আগুনের তেজ বাড়ানো।

যশোদা এসে বলল, "সর্ দেখি, আমিও খানকয়েক বাসন মাজি।"

"না দিদি—আমিই করে নিচ্ছি।"

"এই জন্যেই তো রাগ করি তোর উপর।"

"তা কর।"

"আচ্ছা, কমল কোথায় রে ?"

"মিছিলে।"

"ছেলেকে সামলাস কিন্তু শিবানী—নিজের দুঃখ আর বাড়াস নি।"

শিবানী হাসল। বেচারী যশোদাদি জানে না যে বাধা দিলেও ওরা মানে না। সাধারণ হৃদয়ানুভূতির বালির বাঁধ দিয়ে দেশপ্রেমের দুরন্ত বন্যাকে রোধ করা যায় না। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভাল, তাতে নিষ্ফল নিষেধের দুঃখ থাকে না।

"শোন্ শিবানী"—

"কি ?"

"কমল আসলে র্যাশন আনতে পাঠাস কিন্তু এ বেলা, বুঝলি ?"

"কেন, মণ্টু যাবে না ?"

"ওর সময় নেই—ও না করেছে। মিছিল করার সময় যার হয় কলেজ কামাই করে তাকে দিয়েই কাজটা করা না বাপু।"

"না, তা ত' বলছি না দিদি। যাবে, ওই যাবে।"

চান করে পূজো করতে গিয়ে শিবানী দেখল যে দেবতার পটের সামনে বসে শাশুড়ী কাঁদছেন।

ভগবান আমার স্বামীকে এবার মুক্তি দাও। শিবানীর চোখের জ্বালায় তার মনের মিনতি রূপ পায়।

রোজই এই সময় ডাক আসে। আজ কিন্তু এলো না। বড় প্রত্যাশায় আছে শিবানী। সেই কবে দিন পনেরো আগে অজয়ের চিঠি এসেছিল।

শাশুড়ী কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন।

দুপুর পড়ে এসেছে। কমল ফেরে নি। শিবানী বসে বসে নিজের শাড়ীর আঁচলটা সেলাই করছিল। শাড়ী তার একটাও ভাল নেই।

শাড়ী পাওয়াই যায় না আর যে দামে পাওয়া যায় সে দাম দিতে বিনয়বাবু রাজী নয়।

"মা"—কমল এসেছে। তার চোখমুখ শুকিয়ে আমসী হয়েছে, মাথার চুল উস্কোখুস্কো।

"না এলেই পারতিস।"

কমল হাসল। ছেলেটার বিশ্রী অভ্যাস। বকলেই হেসে ফেলে শিবানীকে জব্দ করে দেয়।

"যা চান কর্ গে।"

"না চান করব না, একমুঠ্ খেতে দাও।"

"হাতমুখটা ধুয়ে আয় বাবা।"

"ধুচ্ছি।"

শাশুড়ী সাড়া দিল, "দাদু এলি ?"

"হ্যাঁ গো ঠাক্‌মা।"

"দেশ সেবা করতে গেলে শরীরটাও ঠিক রাখা উচিত রে ভাই।"

"হ্যাঁ ঠাক্‌মা।"

"হ্যাঁ ত বলছিস্ কিন্তু মনে রাখিস্ কৈ দুষ্টু কোথাকার!"

"তুমি ঘুমোও ঠাক্‌মা, খেয়ে আসি।"

"যা ভাই।"

খেয়ে দেয়ে কমল ডাকল, "মা"—

"কি ?"

"রাগ করবে না তো ?"

"আমি কত ভালমানুষ তা জানিস্ না তুই ?"

"জানি।"

"তবে ? রাগব কেন ? এতদিন যদি রাগতুম তবে তোর ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে যেত না ?"

"তাও জানি, কিন্তু ভালমানুষ বলেই ত' না বলে পারি না।"

"কি বলবি বল্।"

"আমি আবার বেরোচ্ছি। সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসব, আর এসেই খুব পড়ব, দেখো তুমি।"

শিবানী নিরাশভাবে ছেলের দিকে তাকাল।

পরে সে বলল, "যা। কিন্তু ঐ বুড়ী ঠাকুরমা আজ যা বলল তা সত্যি উপেক্ষা করিস্ না বাবা।"

"আচ্ছা মা।" আবার হাসল কমল। হেসে বেরিয়ে গেল।

চোখে জল আসে শিবানীর। তাঁর মত, অবিকল তাঁর মত।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে শিবানীর চোখের জলে ঝাপসা দৃষ্টির সামনে অতীতের ঝাপসা ছবিগুলো আবার ভীড় করে আসে।...

১৯৩৩ সালের আগষ্ট মাস। বিকেল বেলা। দু-তিনদিন বাইরে থেকে সেদিন অজয় ফিরে এসেছে। বাড়ীতেই ছিল সে তখন। ঘুমোচ্ছিল।

এমনি সময়ে হঠাৎ সিঁড়ি বেয়ে অনেকগুলো জুতোর আওয়াজ ভেসে এল।

দরজায় মৃদু করাঘাত।

শিবানী দরজা খুলল। সামনে সাহেব এস্ পি রিভলভার হাতে, পেছনে জন দশেক রাইফেলধারী পুলিশ। বোঝা গেল বাড়ী ঘেরাও হয়েছে।

সাহেব পুলিশদের বলল, "সার্চ্চ করো।" নিজে গিয়ে অজয়কে ডেকে তুলে তার হাতে হাতকড়া লাগাল সে।

সাহেব বলল, "চল, প্লীজ—"

অজয় বলল, "কেন ?"

কোন্ এক পুলিশের সাহেব না কাকে বিপ্লবীরা হত্যা করেছে। তারই হত্যাপরাধে অজয়কে অভিযুক্ত করা হচ্ছে।

ঘরবাড়ী সব খানাতল্লাস ক'রে, সকলের নাম লিখে, জেরা করে, ব্যতিব্যস্ত করে, শঙ্কিত করে তুলল পুলিশেরা।

অজয় বলল, "পাঁচ মিনিট সময় দাও সাহেব।"

সাহেব বলল, "আচ্ছা।"

মায়ের সামনে দাঁড়াল অজয়, "মা শেষ পর্য্যন্ত ফাঁসি যেতে পারি হয়ত, কিন্তু তাতে দুঃখ পেয়ো না। চিরদিন, অনন্তকাল তুমিই আমাকে পাবে—সুতরাং এ জন্মে হারানোর জন্য দুঃখ পেয়ো না।"

মা বললেন, "ফাঁসি-টাসি কিছু হবে না, তুই এগিয়ে যা'ত। আমার কথা ভাবিস্ না। দেবতার চরণে উৎসর্গ করেছি তোকে।" পরে স্বর নীচু করে বললেন, "মেরেছিস্ কি না মেরেছিস্ আমি জানি না, জানতেও চাই না, তবে তুই একশ'টাকে মেরে এলেও তোর জন্য অহঙ্কার আমার কমবে না।"

অজয় মাকে প্রণাম করে ছেলেকে কোলে নিল। বলল, "খোকা —"

কমল তখন কতটুকু? পাঁচ বছর পেরোতে চলেছে বোধ হয়। উত্তর দিল সে, "উঁ ?"

"আমি অনেক দূরে যাচ্ছি বাবা—?"

"কত দূরে বাবা ?"

"অনেক দূর।"

"কবে আসবে ?"

"কবে ?" অজয় তাকাল শিবানীর দিকে।

শিবানী অজয়কে প্রণাম করল।

পায়ের উপর শিবানীর চোখের জল।

অজয় বলল, "ওর জন্যই হয়ত বেঁচে যাব শিবানী, দেখো তুমি! ভয় পেয়ো না, মা আর খোকার যত্ন নিও। মনে রেখো শিবানী যে, দেশোদ্ধারের জন্য একদল লোককে চিরদিনই আত্মবলি দিতে হয়।

আমরা দেব একভাবে, তোমরা দেবে অন্যভাবে। তোমার দেওয়ার পালাও আজ থেকে সুরু হল। অখ্যাত সৈনিক তোমরা, কেউ হয়ত জানবে না কিন্তু তাতে নিরাশ হয়ে পেছপাও হয়ো না।”

সেদিনও চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। সেই ঝাপসা দৃষ্টির সামনে থেকে অজস্র পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে অজয় অদৃশ্য হয়ে গেল সেদিন।

কত চেষ্টা হল। সব গয়না গেল শিবানীর, শাশুড়ীর সঞ্চিত সব গেল, পৈত্রিক জমিজমা আর সম্পত্তিতে অজয়ের অংশেরও প্রায় সব গেল অজয়কে বাঁচাতে। তবু ফাঁসির হুকুম হলো। আরো টাকা খরচ হল, চাঁদা জোগাড় করে কর্ম্মী ছেলেরাও টাকা এনে দিল। শাশুড়ী ঠাকুরের পায়ে তুলসীপাতা দিয়ে রোজ বলতে লাগলেন, “ফাঁসি হবে না, বুঝলে মা, তা হবে না। আমার প্রাণের বেদনা কি ঠাকুরেরা বুঝবেন না?”

হয়তো ঠাকুরেরা বুঝলেন কিম্বা হয়ত টাকা ও আপীলের গুণেই ফাঁসি রদ হল। পরিবর্ত্তে হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। সবাই মনে মনে খুসী হল। যাক্, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।

বিনয়বাবু কিন্তু উত্তেজিত হয়ে উঠল। কত টাকা গেল, তাছাড়া যখন তখন পুলিশ এসে ধমকায়, হুজ্জোৎ করে। ওকালতি চলে না, কিন্তু মনে হয় যে বিপ্লবী ভাইয়ের জন্যই বুঝি পসার জমে না। একদিন বলল সে, “অজয়টা আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে মা।”

মা গর্জ্জে উঠলেন। রাগে, দুঃখে সেদিন শাশুড়ীর যে চেহারা দেখেছিল শিবানী তা সে চিরদিন শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে মনে রাখবে।

গর্জ্জন করে মা বললেন, “বিনয়, শুনে রাখ যে, আজ আমি নিজেকে, নিজের গর্ভকে সার্থক মনে করি ঐ অজয়ের জন্য। সর্ব্বনাশ বলছিস্, যদি কোনদিন সম্মান পাস মানুষের সমাজে তাহলে তুই যে অজয়ের ভাই বলেই সম্মান পাবি তা মনে রাখিস্।”

তারপরে একদিন এল। ১৯৩৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। আন্দামানের ডাক।

কলকাতায় জাহাজ-ঘাটে দাঁড়িয়েছিল তারা। তখন দুপুর বেলা। মধ্যাহ্নে সূর্য্যের আলোর নীচে গঙ্গার রূপালী জল ঢেউ খেলে নাচছে। তারি উপর দিয়ে মস্ত বড় জাহাজটা দুলতে দুলতে, ডাক ছেড়ে, কালো ধোঁয়ায় আকাশকে আবিল করে ক্রমে দূরে, দূরে মিলিয়ে গেল।

কালো সমুদ্রের কালো জলের মধ্যে একটা দ্বীপ। আন্দামান। কালাপানি।

তারপরে দেশের অনেক রূপ বদলাল। রাজনীতির সুর বদলাল। দূর দ্বীপ থেকে চিঠি লিখে জানাল অজয় যে, সে আর সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করে না।

১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে আন্দামানের সেলুলার জেলে রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন আরম্ভ করল। তাদের ভারতবর্ষে ফিরিয়ে নিতে হবে সরকারকে, তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে প্রসারিত করতে হবে, পুনর্ব্বিচার করতে হবে। সে দলে অজয়ও ছিল।

দেশের রাজনৈতিক-গুরু গান্ধীজী তাদের আশ্বাস দিয়ে অনশন বন্ধ করালেন। বন্দীরা জানাল যে, তারা এখন থেকে শান্তির পথেই লড়াই করবে। সন্ত্রাসবাদ একটা ঐতিহাসিক উত্তেজনা, চিরস্থায়ী ব্যাপার নয়, এখন তারা সে মতবাদ আর পোষণ করে না। অজয়ও জানাল সেকথা।

১৯৩৮ সালে বহু বন্দীদের আন্দামান থেকে ফেরত নিয়ে আসা হল ভারতবর্ষে। অজয়ও এল। সে গেল দেউলী জেলে।

কিন্তু গান্ধীজীর আশ্বাস সত্য হল না। বন্দীরা মুক্তি পেল না, মতবাদ পরিবর্ত্তন করা সত্ত্বেও তাদের দাবী মিটল না।

আবার অনশন। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে, আলিপুর জেলে।

তাতেও অজয় ছিল। সেই সময় তাকে দেখতে গিয়েছিল শিবানীরা। কি উৎকণ্ঠায় যে দিনগুলো কেটেছে তখন!

আবার গান্ধীজী তাদের ভার নিলেন। অনশন বন্ধ হল। সরকারও আশ্বাস দিলেন। ছাড়লেনও অনেককে। কিন্তু রইলও যে অনেক। অজয়ও রইল। এখনো রয়েছে। কবে সে ছাড়া পাবে তা বিধাতাপুরুষও জানেন না, একমাত্র সরকারই জানেন।

এর চেয়ে বোধ হয় ফাঁসিই ছিল ভাল। লোকটা আছে অথচ নেই—এর চেয়ে বিয়োগান্ত কি হতে পারে?

আজ অজয়ের জন্মদিন। একটা মালা আনতে বলা উচিত ছিল কমলকে। ভুল হয়েছে।

এলোমেলো চিন্তার ফাঁকে ঘুম এলো শিবানীর।

শিবানী বাঁচল। একমাত্র ঘুমের সময়েই শিবানী বাঁচে। জাগরণ তার কাছে মৃত্যুর সমান।

"শিবানী, ও শিবানী"—যশোদার ডাকে ঘুম ভাঙ্গল।

"কতক্ষণ ধরে ডাকছি—এ যে তোর কুম্ভকর্ণের ঘুম বাবা! এদিকে যে মণ্টুর বাবা এসেছে, মণ্টুরা এসেছে, সুজাতার মেয়ে কাঁদছে বার্লির জন্য—ওঠ্।"

"উঠছি দিদি।" লজ্জা পেল শিবানী। সত্যি বিকেলের রোদ রাঙা হয়ে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি ছুটে গেল সে রান্নাঘরে। উনুন ধরাল।

যশোদা হেঁকে বলল, "শিবানী!"

"কি?"

"কমলকে র‍্যাশন আন্‌তে বলেছিলি?"

"না তো দিদি—ঐ যাঃ, ভুলেই গিয়েছি।" শিবানী ভয়ঙ্কর অনুতপ্ত হল।

যশোদা ফেটে পড়ল রাগে, "তা ত' ভুলবিই, নিজের ছেলে যে!"

বিনয়বাবু গর্জ্জে বলল, "আসুক শূয়ার আজ, ঘাড় ধরে বার করে দেব বাড়ী থেকে। যত সব স্বদেশীরা আমার সর্ব্বনাশ করে দিল।"

শিবানীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। জলের কল বিগড়ে গেলে যেমন জল পড়ে অঝোর ধারে, যেমন থামানো যায় না তা, তেমনিভাবে।

"বিনয়"—শাশুড়ী কাঁপতে কাঁপতে উঠে এসেছেন বারান্দায়।

"বড় বৌমা"—তিনি ডাকলেন।

বিনয়বাবু বেরিয়ে এল।

"কি বলছ?"

শাশুড়ীর বয়স যেন ত্রিশ বছর পেছিয়ে গেছে, তাঁর লোলচর্ম্ম যেন আবার সোনার পাতের মত মসৃণ শোভায় টক্‌টক্ করছে, দুর্ব্বল দৃষ্টিতে যেন বাজপাখীর চোখের মত ধারাল ভাব।

"শোন তোমরা,—অজয়ের বৌ আর তার ছেলেকে নিয়ে যখন তখন যা তা বলো না তোমরা। তোমাদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি। আমি জানি, কমল যাই করুক, সে ভাল কাজই করবে। সিংহের বাচ্চা সিংহই হয় বিনয়, এটা ভুলো না।"

"তুমিই মাথা খাচ্চ ছেলেটার"—বিনয়বাবু বিরক্তভাবে বলল। মাকে বেশী বলার সাহস তার নেই, তবু বলল।

"খাই খাব, তোমার কি? ওসব কথা ছাড়, ছোট বৌমা আর কমল সংসারের জন্যও খাটে, দিনরাতই খাটে—অথচ এ সংসারে ওদের অধিকার তোমাদের চেয়ে কম নয়। শেষ কথা বলে রাখছি, আমি যতদিন বেঁচে আছি, ওদের একটা কথাও বল্লে ভাল হবে না কিন্তু।"

কাঁপতে কাঁপতে আবার শাশুড়ী ফিরে গেলেন নিজের ঘরে।

শিবানী কাঁদে। মাগো, তুমি যতদিন বেঁচে আছ, ততদিনই। কিন্তু তুমি মরে গেলেও কমলের বাপ যদি জেলেই থাকে তখন, তখন কি হবে?

উনুন ধরেছে। অনেক কাজ। কান্নাকাটি করে একেবারে সাধারণ ঝগড়াটে মেয়েলোক হতে পারে না শিবানী।

চোখের জল মুছে চায়ের জল চাপাল সে। অনেক কাজ। চা, বার্লি, ভাত, ডাল, তরকারী, সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়া, খাওয়ানো, বাসন মাজা, সব সারতে সারতে গীর্জ্জার ঘড়িতে রাত বারোটা প্রায়ই বাজে ঢং ঢং করে। আজো বাজবে। কলে জল এসেছে। জল ভরতে হবে কলসীতে। ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচির শব্দ ভেসে আসছে। কমলটা কি এখন আসবে না? অজয় এখন কি করছে আলীপুর জেলে? বিকেলের সোনামাখানো রোদের দিকে তাকিয়ে কি সে শিবানীর কথা ভাবছে?

রাত।

ছেলেরা সব পড়ছে। কমল এখনো ফেরেনি।

এই একটু অবসর। যশোদা গড়াচ্ছে, সুজাতা মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে নভেল পড়ছে, বিনয়বাবু দপ্তরে। এই অবসরে স্বামীর ছবিটার নীচে গিয়ে বসবে শিবানী।

"বৌদি"—

"কে?"

"আমি রজত।"

"আসছি ভাই, বোস।"

রজত অজয়দের গ্রামের ছেলে। সেও জেল খেটেছে সাত বছর, বছর চারেক হল ছাড়া পেয়েছে। দু'বছর নিজের গ্রামে অন্তরীণ ছিল সে, তারপরে একেবারে ছাড়া পেয়েছে। এখন সে সাম্যবাদী দলের কাজ করে, আর একটা কাগজের অফিসে চাকুরী করে। তার বয়স প্রায় বত্রিশ হবে।

"কেমন আছ ভাই?" শিবানী প্রশ্ন করল।

"ভালই আছি বৌদি।"

"মাঝে এখানে ছিলে না, কমল বলল।"

"হ্যাঁ, কলকাতা গিয়েছিলাম, কাল ফিরেছি।"

"কলকাতা গিয়েছিলে?" শিবানীর চোখে যেন ক্ষীণ একটা আলো জ্বলে উঠল।

"হ্যাঁ।"

"তোমার—তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করেছিলে নাকি?" টেনে টেনে, প্রত্যাশায় কম্পিত বক্ষে শিবানী প্রশ্ন করল।

রজত মাথা নাড়ল।

"কেমন আছেন তিনি?" শিবানী দু কান খাড়া করে থাকে উত্তরের জন্য।

রজত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কি যেন দেখল, পরে মুখ ফিরিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে বলল, "ভালই আছেন বৌদি। আপনাদের সকলের কথা জিজ্ঞেস করলেন আর ফিরে এসে যে আমাদের দলেই কাজ করবেন তাও বললেন। কমলের মাথায়ও স্বদেশ-সেবার ভূত চেপেছে শুনে খুশী হলেন। কিন্তু বললেন যে, আপনি যেন ওকে লেখাপড়ায় পণ্ডিত করে তোলেন সত্যিকারের জ্ঞান না পেলে সত্যিকারের মানুষ হওয়া যায় না।"

শিবানীর চোখে জল এলো।

"কবে—কবে ছাড়া পাবে জান রজত?"

"বছর খানেকের মধ্যেই পাবে বৌদি। আমরা আন্দোলন চালাচ্ছি, যুদ্ধের জন্য সরকার ব্যস্ত বলে দেরী হচ্ছে। আমরা গিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখাও করেছি। এবার শিগগিরই একটা নিষ্পত্তি হবে।"

আশা পায়, বল পায় মনে শিবানী। কতবার এমনি আশা পেয়েছে, আবার ভেঙ্গেছেও—তবুও নূতন করে আশা পায় সে।

কমল এল।

"কি হে তরুণ দেশ-সেবক, পড়া শোনা কেমন হচ্ছে?" রজত প্রশ্ন করল।

কমল হাসল, "রজত কাকা! তা হচ্ছে কিছু কিছু—মানে ফাঁকিই বেশী দিচ্ছি।"

শিবানী সস্নেহে তাকাল ছেলের দিকে।

"না, ফাঁকি কোন কাজেই চলবে না—তোমার বাবা তাই বলে পাঠিয়েছেন আমায় দিয়ে। জ্ঞানযোগে সিদ্ধিলাভ করলেই কর্ম্মযোগ সহজ হয়।"

"বাবা বলেছেন! আচ্ছা।" বাপের কথায় একটা শ্রদ্ধা ফুটে উঠল কমলের মুখে।

শিবানী চোখ মুছল অলক্ষ্যে।

"আচ্ছা এবার আসি বৌদি।"

"আসবে?"

"হ্যাঁ। আবার পরে আসব।"

"আচ্ছা এসো ভাই। তোমার দাদাকে একটা চিঠি লিখো—আমাদের অনেকদিন চিঠি দেন না। আর—আর—তাদের মুক্ত করো ভাই, দেশে যে তাঁদের দরকার।"

"সে কি আমরা বুঝি না বৌদি? আমরা কি তাঁদের ভুলতে পারি?"

রজত চলে গেল দ্রুতপদে।

কমল পড়তে বসেছে।

অজয়ের ছবির তলায় শাশুড়ী বসে আছেন। ছেলের ছবি দেখছেন।

"বৌমা!"

"কি?"

"কাছে এসো।"

শিবানীকে বুকে টেনে নিয়ে বৃদ্ধা বললেন, "বড় সৌভাগ্যবতী তুমি মা, আমার বীর অজয়ের বীরাঙ্গনা তুমি।"

শিবানী স্বামীর ছবির দিকে তাকাল। মালা দুলছে ছবির উপর। গাঁদা ফুলের মালা। দুষ্টু ছেলেটা লুকিয়ে লুকিয়ে এনে বাপের পূজো করেছে। ঠিক মনে রেখেছে, ভোলে নি যে, আজ ওর বাপের জন্ম-তিথি।

"বৌমা!"

"মা।"

"রজত কি বল্ল?"

"উনি ভালই আছেন।"

"ভগবান"—বৃদ্ধা চোখ মুছলেন, ডাকলেন, "বৌমা!"

"কি মা?"

"অনেকদিন দেখি না ওকে—কবে মরে যাব কে জানে! ওকে মুক্ত দেখার জন্যই বেঁচে আছি—কিন্তু যদি মরে যাই? না মা, তুমি যাওয়ার ব্যবস্থা কর, আমি যে করে হোক টাকা যোগাড় করব।"

"সত্যি, সত্যি মা?"

"হ্যাঁ রে পাগলী।" শাশুড়ী হাসলেন।

শিবানী তাকাল স্বামীর ছবির দিকে। স্বামীর যুবকাকৃতি। জেলে স্বামীর রূপের রোগজীর্ণ রূপান্তর শিবানী দেখেছে তবু স্বামীর কথা ভাবতেই এই ছবির তেজমণ্ডিত, যৌবন-দৃপ্ত, বলিষ্ঠ চেহারাটাই তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার স্বামী ত বুড়ো হবে না। মানুষের মনে চিরদিন সে বেঁচে থাকবে।

ছেলের দিকে তাকাল শিবানী। সে একমনে পড়ছে। তার ললাটে চিন্তার রেখা কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

শিবানীর মনে একটা শান্তি নেমে এলো। দুঃখ আর করবে না সে। তার ঐ কাজ। তার স্বামী আর তার ছেলে 'বন্দে মাতরম্' বলে সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে যাবে, কারাগারের অন্ধকারেই তারা স্বপ্ন দেখবে আর সে তাকিয়ে থাকবে তাদের দিকে। অন্য কাজ সে আর করবে না।

তবু কবে—কবে অজয় মুক্তি পাবে? একটা দিন নয়, মাস নয়, বছর নয়। বারো বছর কেটে গেছে—বারো বছর—

চলতে চলতে রজতের চোখ জ্বালা করে। জল নয়, যেন রক্তের একটা প্রবল উচ্ছ্বাস এসে চোখের অতি সূক্ষ্ম জালের মধ্যে বারংবার আঘাত করছে।

সে আজ শিবানীকে দুটো মিথ্যে কথা বলেছে। মাস তিনেক আগে অজয়দা ছাড়া পেয়েছিল কিন্তু জেলের ফটকের সামনেই, ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়ার নাগপাশে, তাকে আবার বন্দী করা হয়েছে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য। অথচ সে শিবানীকে বলেছে যে শিগগিরই অজয়দা ছাড়া পাবে।

আর একটা কথা এই যে, অজয়দা মোটেই ভাল নেই। রোগে রোগে জর্জ্জর হয়ে সে ছ'মাস ধরে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছে। ডাক্তারেরা বলেছে, গ্যালপিং থাইসিস্। অথচ সে বলেছে, অজয়দা ভালই আছে।

সব কথা বলবে বলেই সে আজ শিবানীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। কিন্তু অজয়দার নিষেধ মনে পড়ায় বলতে পারেনি।

অজয়দা বলেছিল, "আমি মরবই, কিন্তু তার সঙ্গে ওদের মৃত্যুর কারণ হতে চাই না। আমার আশা যে ওদেরই উপর—ওরা বাঁচুক। না রজত, আমার অসুখের কথা তুই বাড়ীতে জানাস্ না, কিন্তু ওদের দেখিস্, খোঁজ খবর নিস্।"

"ওদের সঙ্গে দেখা করতেও চাও না?"

"না হলেই ভাল হয়, মায়ায় জড়ালে কষ্টকে যে কষ্ট মনে হবে রে।"

অজয়দা মুক্তি পাবে না—রজত জানে। আরো অনেকেই পাবে না। দুর্ভিক্ষ, মড়ক, যুদ্ধ, চোর জুয়াচোরের প্রাদুর্ভাব, পরাধীনতার দুর্ব্বহ ভার—দেশ ধ্বংসের পথে নিত্যই এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের আজ দরকার হয়েছে আমাদের মধ্যে। তবু ওরা মুক্তি পাবে না। রজত জানে যে, কারাগারের চারটে দেয়ালের ছায়ায় ওরা রক্ত বমি করে মরবেই। কিন্তু কেন? কারাগারের দেয়ালগুলো কি ভেঙ্গে ফেলা যায় না? দেশে কি মানুষ নেই?

আবার চোখ জ্বালা করে রজতের। রক্তের উচ্ছ্বাস নয়, এবার সত্যি জল এলো চোখে।

শ্যামরায়ের মৃত্যু

শ্যামরায়ের মন্দির। মন্দিরের গা বেয়ে হৃষ্টপুষ্ট অশ্বত্থের চারা বেরিয়ে এসেছে, চুন-সুরকি খসে পড়ে পড়ে মন্দিরের প্রাচীনত্ব তথা আভিজাত্যকে দিনের পর দিন বাড়িয়ে তুলছে। খুব বড় নয়, মাঝারি আকারের মন্দিরটি। আকৃতির চেয়ে মাহাত্ম্যই বেশী তার।

বিগ্রহ শ্যামরায়ের। কিশোর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন—পরিধানে রাখাল বেশ। মন্দিরের ভিতরকার অবস্থাও তার বাহ্যিক আকৃতির মতই। শ্যামরায়ের সিংহাসনের পঞ্জরে উইপোকারা দলে দলে বাসা বেঁধেছে, তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ আর আসবাবপত্রে মলিনত্বের ছায়া।

কিন্তু মাহাত্ম্য আছে শ্যামরায়ের। প্রায় একশ বছর আগে বর্ত্তমান পূজারীর প্রপিতামহ বাসুদেব ভট্টাচার্য্য একদিন স্বপ্নঘোরে দেখেছিলেন ঐ শ্যামরায়কে—দেখেছিলেন যে শ্যামরায় যেন তাঁকে বলছেন, "বড় কষ্টে আছি বাসুদেব। তোদের রাঙা বিলের নাম সুন্দর হলেও তা আমার থাকবার জায়গা নয়; জল, কাদা সাপ-খোপের মধ্যে কি করে থাকি বল্‌ত ? আমায় শিগগির শিগগির উদ্ধার কর্‌।"

শ্যামরায়কে পঙ্ককুণ্ড থেকে উদ্ধার করে বাসুদেব ভট্টাচার্য্য রাতারাতি দেশবিদেশে সিদ্ধপুরুষ বলে খ্যাতিলাভ করলেন। সে খ্যাতির সংবাদ ঐ এলাকার মানে লক্ষ্মীপুরের জমিদার শিবেশ্বর রায়ের কানে পৌঁছাল। বাসুদেব ভট্টাচার্য্যকে নিষ্কর ভূমিদান করে শ্যামরায়ের জন্য তিনি একটি মন্দির তৈরী করে দিলেন। যে মন্দিরের বলিরেখা ভেদ করে আজ হৃষ্টপুষ্ট অশ্বত্থের চারা বেরিয়ে এসেছে ওইটিই সেই মন্দির। দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে গেল শ্যামরায়ের কথা। এল অগণন ভক্তের দল। এল অসংখ্য অনুগ্রহ-লোভীর দল। কত লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি সারল, কত

মানুষের মোকদ্দমায় জয়লাভ হল, কত নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচল শ্যামরায়ের কৃপায়। কৃতজ্ঞ ভক্তের দল পরিবর্ত্তে নানা অর্ঘ্য দিল—ঘি, দুধ, ফল, মিষ্টি, দক্ষিণা। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় তুমুল কীর্ত্তনের রোল উঠত শ্যামরায়ের মন্দির-প্রাঙ্গণে—চোখের জল ফেলে ভক্তেরা লাফাত না-তো ঝিম মেরে বসে থাকত। কষ্টিপাথরের শ্যামরায় বহু ভক্তের কৃতজ্ঞতাকে স্বীকার করে নিয়ে পরিতৃপ্তির হাসি হাসতেন। কিন্তু সেদিন আর নেই। একশ' বছর আগেকার ইতিহাস এখন ঝাপসা হয়ে এসেছে।

মড়ক এসেছিল। শ্যামরায় বর্ত্তমান থাকতেও মৃত্যু-বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হয়েছিল তাঁর গ্রাম্য ভক্তেরা। বেশীর ভাগই মারা গেল, যারা বাঁচল তারা শেষে গ্রাম ছেড়ে পালাল। নির্জ্জন গ্রাম্য মন্দিরে শ্যামরায় একা পড়ে রইলেন, আর রইলেন তাঁর সেবক বলরাম ভট্টাচার্য্য—বাসুদেবের ছেলে—বর্ত্তমান পূজারী জনার্দ্দনের পিতা।

তখন থেকেই একটু ভাঁটা পড়ল ভক্ত-স্রোতে।

তারপর একটা ব্যাপার ঘটল। দশ মাইল দূরে যে মহানগরীটা ছিল তা ক্রমশঃ রাহুর মত গ্রাস করে চলল অন্যান্য গ্রাম এবং অবশেষে লক্ষ্মীপুরের প্রান্তে এসে থামল।

তারপর ইতিহাসের ঘূর্ণ্যমান চাকার সঙ্গে এল নূতন নূতন লোক, গড়ে উঠল বড় বড় অট্টালিকা, নির্ম্মিত হল বড় বড় ফ্যাক্টরী আর জুট-মিল। দামী অর্ঘ্যের স্তূপ কমে এল বটে, কিন্তু নূতন ভক্ত জুটল শ্যামরায়ের। কুলি, মজুর, চোর, দালাল। কিছু দেয় না, শ্যামরায়ের কাছে তারা শুধু নিরন্তর চায়। শ্যামরায়ের চোখের তারা স্তিমিত হয়ে এল। গায়ে জমল ধূলোর আস্তরণ, বেণারসী চেলীর গায়ে পচন ধরল, ভোগরাগের দৈব আভিজাত্য কমে এল। সিংহাসনের গা টিপলে এখন মচ মচ করে ভেঙ্গে যায়, মন্দিরের গা থেকে ঝপ ঝপ করে চুন-সুরকি খসে পড়ে, প্রায়ান্ধকার মন্দিরাভ্যন্তরে সংস্কারহীনতার চাপা ও ভ্যাপসা গন্ধ অনবরত থম থম করে।

কিন্তু ভূমিকা থাক্।

মন্দির থেকে দুশো গজ দূরবর্ত্তী যে পাটকলটার চিম্‌নী বেয়ে গল গল্ করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে তার মালিক নাগরমলজী একদিন তার অফিস-ঘরে দ্রুত ও উত্তেজিতভাবে পায়চারী করছিল।

রাহুর মত এই মহানগরীটা যখন দূরে ছিল—তখনকার কথা—পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা বলছি। নাগরমলের বাবা সাগরমল আর তার বাবা স্বরষমলের কাহিনী। সে কাহিনী সবাই জানে। তিল থেকে তাল আর প্রবালকীট থেকে প্রবাল-দ্বীপ তৈরী করার কাহিনী। ধান-চাল আর পাটের মহাজন থেকে অজস্র জোত, অসংখ্য অট্টালিকা ও বহু জুট-মিলের মালিক হওয়ার অতি দীর্ঘ কাহিনী। জটিল মস্তিষ্কের জট-পাকানো বুদ্ধি, সর্ব্বগ্রাসী লোভের বহুদূর প্রসারিত বাহু আর জালিয়াতির কাহিনীকে সবিস্তারে বলে ইতিহাসের নিরস ও শুকনো স্বাদ পেয়ে লাভ কি? তার চেয়ে কাহিনীতেই ফিরে আসি।

মিলের ম্যানেজার বাঙালী বাবু। অবিকল সাহেবদের মত মেজাজ তার, তামাটে চেহারাতেও সাহেবী চেকনাই। নাম মিঃ বাসু।

বাসু বলল, "যুগ বদলেছে নাগরমলজী, মজুরদের তেজ দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে।"

নাগরমল হাসল, "যুগ বদলেছে—তা বটে"—

বাসু বলল, "মিলের মজুররা আজকাল এক জোট হয়েছে—দিনরাত দল পাকিয়ে ফুস্‌ফাস্ করে"—

"হুঁ"—নাগরমল মাথা নাড়ল, পাগড়ীটাকে খুলে টেবিলের উপর রাখল, তারপরে পকেট থেকে রুমাল বার করে টাকের ঘাম মুছে বলল, "মিঃ বাসু"—

"বলুন"—

"যুগ বদলায় তা মানি, কিন্তু তাই বলে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে কি চলবে?"

"আজ্ঞে না"—

"মজুর কুলি ছোটলোকদের দল আজ মাথায় চড়তে চাইলেই কি মাথাটাকে নীচু করে দিতে হবে ?"—

"Certainly not"—

"তবে হুঁসিয়ার হোন, খোঁজ লিন কে এদের দলের সর্দ্দার"—

"তা আমি জানি"—

"কে সে ? কি নাম তার ?"

"ত্রিলোচন দাস।"

"সেই কানা লোকটা, তাই না ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

নাগরমল চুপ করে ভাবল খানিকক্ষণ, তার ধবধবে সাদা ললাটদেশে কালসাপের মত মোটা মোটা কতকগুলো দুর্ব্বোধ্য রেখা আত্মপ্রকাশ করল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল নাগরমল।

ঘরের মধ্যে দ্রুতবেগে ফ্যান ঘুরছে, টেবিলের উপরকার কাগজগুলো সশব্দে নড়ছে, দেওয়ালের বড় ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে, মিঃ বাসুর টার্কিশ সিগারেটের ধোঁয়া ক্ষীণদেহ সরীসৃপের মত ঘরের শূন্যতায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

"মিঃ বাসু"—

"ইয়েস্ প্লীজ্ ?"

"খবর লিন, আরও ভালভাবে খবর লিন, খবর লিন ত্রিলোচনের দুর্ব্বলতা কোথায়—কোথায় আঘাত করলে এক মুহূর্ত্তে কামিয়াব হওয়া যাবে।"

আবার টাক মুছল নাগরমল, ললাটের কালসাপগুলো হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে গেল, তার মুখে দেখা দিল প্রশান্ত হাসি—সে বলল, "ঘাবড়াবেননা বাসুবাবু, হিম্মৎ চাই—তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বসন্ত হয়, মারীগুটিকায় আচ্ছন্ন মুখমণ্ডলে মৃত্যুর ঘোষণা। শ্যামরায়ের ওখানে অর্ঘ্য পড়ে।

কলেরা হয়, তরল, বিবর্ণ ভেদবমির মাঝে অসহায়ভাবে কাৎরায় ওরা। শ্যামরায়ের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়। শ্যামরায়, রক্ষা কর।

দারিদ্র্য, মৃত্যু, ব্যাধি, দুঃখ। শ্যামরায়, বাঁচাও, মঙ্গল কর, রক্ষা কর।

জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য শ্যামরায়ের চরণামৃত বিতরণ করেন, তুলসীচন্দন আর পবিত্ররজ দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেন, "শ্যামরায় তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করবেন, শ্যামরায় আমার জাগ্রত দেবতা।"

ত্রিলোচন—কানা ত্রিলোচন। ডান চোখটা তার বসন্তের ঘায়ে বসে গেছে, মুখমণ্ডলে আহত শ্বাপদের হিংসা। বাঁ চোখের তারাটাকে বড় বড় করে উত্তেজিত কণ্ঠে সে সবাইকে বলে, "শ্যামরায়, শ্যামরায় বাঁচাবে তোদের, ওরে বোকারা, আমার কথা শোন্—বেচারী ঠাকুর দেবতারা মানুষের কিছু করতে পারে না—আমাদের দুঃখ দূর করার ভার আমাদেরি হাতে"—

সব কাজে সবাই মাথা নীচু করে যে ত্রিলোচনের কাছে, তার মুখে একথা শুনে লোকেরা রাগ করতে পারে না, কেবল হাসে। পাগল, ত্রিলোচনটা পাগল, দশজনের কথা ভেবে ভেবে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, দশজনের কথাই ভাবে ত্রিলোচন। দিনরাত।

ম্যানেজার বাসু সেদিন মঙ্গলকে ধরে মারল।

ত্রিলোচন গিয়ে সামনে দাঁড়াল, বলল, "খবরদার ম্যানেজারবাবু—ওসব চলবে না।"

"হোয়াট্?" বাসু গর্জ্জন করে এগিয়ে এল। কিন্তু হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়াল সে। ত্রিলোচনের পেছনে আরও একশ'জন এসে দাঁড়িয়েছে।

একচক্ষু ত্রিলোচন যেন একটা সেনাপতির চেয়ে কম নয়। তার পশ্চাদ্বর্ত্তী বাকী সবাই যেন এক একজন সৈনিক। তাদের চোখে শাণিত ইঙ্গিত, অনর্থের সঙ্কেত।

বাসু পিছিয়ে গেল।

যখন খাটুনীর ঘণ্টা বাড়ল তখন তার অনুপাতে মজুরী বাড়ল না।

মজুরেরা তাকাল ত্রিলোচনের দিকে। একটা চোখ না থাকলেই বা কি? একটা চোখ দিয়েই অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখতে পায় ত্রিলোচন।

ত্রিলোচন বলল, "শালারা ভেবেছে যে তোদের নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা যায়"—

"তাহলে কি হবে?"

"কি হবে তা কি জানিস না হতভাগারা? কাজ বন্ধ কর—ধর্ম্মঘট"—

ত্রিলোচনের একটা কথায় যন্ত্রের গান বন্ধ হয়ে গেল।

সেই ত্রিলোচন যদি ভগবানকে না মানে, যদি সে শ্যামরায়ের মত জাগ্রত দেবতাকে উপহাস করে, তাহলে কি ভাববে লোকেরা? পাগল, পাগল আমাদের ত্রিলোচন দাস।

খবর এল।

আর একটু হলে নাগরমল লাফিয়ে উঠত, কিন্তু সে নিজেকে সাম্‌লে নিল।

সে বলল, "কাজ হয়েছে বাসুবাবু—কেল্লা মেরে দিয়েছি।"

বাসু বুঝতে পারল না, ডান চোখের ভ্রূ তুলে প্রশ্ন করল, "মানে?"

"মানে আপনি যান আর জিতেনকে পাঠিয়ে দিন।"

"আচ্ছা। কিন্তু আমি বলছিলাম কি জানেন?"

"কি?"

"ত্রিলোচনকে বরখাস্ত করলে কেমন হয়?"

"আপনি পাগল মিঃ বাসু। আরও ধর্ম্মঘট চান? না না, যা বললাম তাই করুন গে।"

জিতেন এল। সাহেবদের পোষা বুলডগের মত দেখতে। খায় দায়, বসে থাকে, দরকার হলে মনিবের ইঙ্গিতে শত্রুর টুঁটি লক্ষ্য করে লাফিয়ে পড়ে।

জিতেন অনেকক্ষণ ধরে নাগরমলের কাছে বসে রইল। অনেক কথা শুনল। কথা শেষ হলে হেসে বলল, "শেঠজী—নির্ভাবনায় থাকুন।"

জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য শ্যামরায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করছিলেন।

"শোন—শোন আমার জাগ্রত শ্যামের কীর্ত্তি"—

পিতা বলরাম ভট্টাচার্য্যের সময়কার কাহিনী। প্রতিদিন নৈশভোগের পরে শ্যামরায়কে শোয়াতেন তিনি—রীতিমত তাকিয়া বালিশ, লেপ তোষকের মাঝে।

তখন শীতকাল—একদিন একটা ভুল করে বসলেন বলরাম। পারিবারিক কারণে মনটা বিক্ষুব্ধ ছিল বলে তাড়াহুড়ো করে শ্যামরায়কে শুইয়ে তিনি বাড়ী ফিরলেন। খানিকবাদে শুয়ে পড়লেন, ঘুমোলেন। ঘুমের ঘোরে হঠাৎ যেন লাঠির ঘা খেলেন তিনি। স্বপ্ন দেখলেন যে, শ্যামরায় যেন তাঁর গরু-খেদানো লাঠি দিয়ে তাঁকে মারছেন আর বলছেন— "লেপটা গায়ে না দিয়েই শুইয়ে এসেছিস তুই, আমায় খাতির করতে বুঝি তোর ভাল লাগে না? অত সহজে নিষ্কৃতি পাবি না—খা লাঠির ঘা—কেমন, শিক্ষা হয়েছে?" উত্তেজিত, ক্রোধান্ধ শ্যামরায়কে তখন যেন আর চেনাই যায় না।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন বলরাম। সবিস্ময়ে দেখলেন যে দেহের উপর লাঠির ঘায়ে কাল্‌চে কাল্‌চে দাগ পড়েছে—স্বপ্ন মিথ্যা নয়। তিনি মন্দিরের দিকে দৌড়ে গেলেন। সত্যি, শ্যামরায়ের অভিযোগ মিথ্যা নয়।

কাহিনী শেষ হল। বিমুগ্ধ মজুরেরা নির্ব্বাক হয়ে বসে রইল। এমন জাগ্রত দেবতা এই শ্যামরায় !

ত্রিলোচন হেসে বলল, "যত্ত সব গাঁজাখুরি গল্প বলছো ঠাকুর—মানুষ-গুলোর মাথা ত খেয়েইছ আবার তাদের হাড়গুলোকেও চিবোচ্ছ মাইরি"—

জিতেন বলে উঠল, "ছিঃ ছিঃ, এমন পাপ কথা বলো না"—

অন্যান্য মজুরেরাও আজ একটু ক্ষুণ্ণ হল।

জিতেন বলে চলল, "ঠাকুর দেবতা, ওঁদের নিয়ে অমন কথা বলতে নেই, আর অমন কথা শোনাও মহাপাপ"—ললাটে হাত তুলে সে শ্যাম-রায়কে প্রণাম জানাল।

জনার্দ্দন বললেন, "হ্যাঁ, সত্যি ত্রিলোচন, অতটা নাস্তিক হওয়া ভাল না।"

অন্যান্য মজুরেরাও শ্যামরায়ের উদ্দেশে প্রণাম জানাল।

ত্রিলোচন উঠে দাঁড়াল, একটা বিড়ি ধরিয়ে সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "তোরা যত সব জানোয়ারের দল—তোদের বোঝাবে কোন্ শালা ? যাঃ মরগে—চুলোয় যা হতভাগারা"—

সে চলে গেল।

জিতেন বলল, "এতটা ভাল না মাইরি, সত্যি বলছি—এটা বাড়াবাড়ি। তুই সবার সর্দ্দার কিন্তু তাই বলে ঠাকুর দেবতাকে গেরাহ্যি করবি না—তা কি হয় ?"

জনার্দ্দন সায় দিলেন, "ঠিক—ঠিক বলেছ"—

মজুরেরা স্তব্ধ হয়ে রইল। সত্যি, ত্রিলোচন বড় অন্যায় কথা বলে, ওর এতটা বাড়াবাড়ি ভাল না। হলেই বা সর্দ্দার, সব কিছুতে সর্দ্দারী করলে কি সহ্য করা যায় ?

ব্যাপারটা একদিন আরও বেড়ে গেল।

কলেরা—বস্তিতে কলেরা দেখা দিয়েছে। আর্ত্ত কোলাহলটা ক্রমশঃ এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে সংক্রামিত হচ্ছে তখন।

শ্যামরায়ের ওখানে গিয়ে সবাই ভীড় করল।

"ঠাকুর, চন্নামেরত দাও—বাঁচাও"—

সহ্য হয় না ত্রিলোচনের।

"চন্নামেরত! চন্নামেরত'তে কলেরা সারবে? ওরে পাগলেরা—বরং চল ডাক্তার ডাকিগে"—

জনার্দ্দন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। প্রাচীন পূজারীবংশের বংশধরের মুখে ক্রোধ ঘনিয়ে এল, তাঁর উজ্জ্বল, গৌরবর্ণ মুখমণ্ডলে অকস্মাৎ একটা রক্তের উচ্ছ্বাস খেলে গেল।

ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, "সাবধান, সাবধান ত্রিলোচন—নাস্তিকতারও সীমা আছে"—

মৃত্যুভয়ে বিবর্ণ মজুরদের চোখেও বিরক্তি ঘনিয়ে এল। তার সঙ্গে ক্রোধ।

জিতেন বলল, "তোমার বাড়াবাড়ি কিন্তু আমরা আর সইব না ত্রিলোচন"—

এক চোখ পাকিয়ে ত্রিলোচন হেসে বলল, "কি করবি? মারবি? মার—কিন্তু যা সত্যি তা বলতে আমি ডরাইনারে শালা। আবার বল্‌ছি শোন্‌, বুদ্ধির মোড় ফেরা—দেব্‌তা ফেব্‌তাতে কিচ্ছু হবে না।"

জনার্দ্দন এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, উত্তেজনার আতিশয্যে তাঁর দেহ থেকে উত্তরীয়টা খসে পড়ল, আগুনের মত টকটকে রঙের ঋজু দেহটাকে কঠিন করে তুলে তিনি বললেন, "শ্যামরায়, আমার জাগ্রত ঠাকুর শ্যামরায়কে তুই বিশ্বাস করিস না?"

ত্রিলোচনও যেন গরম হয়ে উঠেছে, দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাচিয়ে,

ভেংচি কেটে সে বলল, "জাগ্রত না কচু, পাথরকে তেলচন্দন আর খাবার দিলেই জাগ্রত হয়ে গেল আর কি!"

"খবরদার"—জিতেন লাফিয়ে এগিয়ে এল।

হঠাৎ যেন বীভৎস হয়ে উঠল ত্রিলোচন, "তোমাদের জন্তই ত' দেশটা উচ্ছন্নে গেল ঠাকুর—কি আফিংই যে খাইয়েছ এই জানোয়ারগুলোকে—উঃ"—

"খবরদার"—অনুগ্রহপ্রার্থী ভক্ত মজুরেরাও চেঁচিয়ে উঠল।

"তবেরে শালা"—আচমকা জিতেন এবং আরও দু'তিনজন এসে ত্রিলোচনের উপর লাফিয়ে পড়ল। মাটির উপর আছড়ে পড়ল সে আর আক্রমণকারীরা অজস্র কিলচড় বর্ষণ করে চলল তার উপর।

জনার্দ্দন বললেন, "থাম, থাম।" মজুর্দের ক্ষিপ্ততা দেখে হঠাৎ তাঁর ভয় হল, ত্রিলোচনের উপর একটু সহানুভূতির উদ্রেক হল।

শেষ পর্য্যন্ত থামল বটে ওরা, কিন্তু তখন ত্রিলোচনের দু'কস বেয়ে রক্তের ধারা নেমেছে, বসন্তের দাগে বিকৃত মুখমণ্ডলে ও চোখের তারাতে একটা আতঙ্ক ফুটে উঠেছে।

ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল, আততায়ী বন্ধুদের দিকে দৃষ্টিপাত করে মৃদুকণ্ঠে সে হেসে বলল, "শেষ পর্য্যন্ত মারলি আমাকে, এ্যাঁ? আমায় মারলি?"

কেউ জবাব দিল না।

টলতে টলতে চলে গেল ত্রিলোচন। আড়ালে গেল সে। যেন পরম একটা লজ্জার হাত থেকে সে আত্মরক্ষা করতে চায়, যেন একটা আহত পশুর মত একা একা সে নিজের ক্ষতকে লেহন করতে চায়। হঠাৎ মুষড়ে পড়ল, শক্তিহীন হয়ে পড়ল ত্রিলোচন—আকাশের বিদ্যুৎ যেন হঠাৎ তাকে অসাড় করে ফেলেছে।

কিন্তু তবু ব্যাপারটা থামে না, মজুরদের শক্তি কমে না। ত্রিলোচন সরে গেছে, তার প্রতাপের ফণা আজকাল আর নেই, তাকে আর আজকাল কেউ আমল দেয় না। তবু নাগরমলের প্রাণে স্বস্তি নেই—মজুরেরা দমে নাই।

কিন্তু কেন?

"বাসুবাবু"—

"ইয়েস প্লীজ্?"

"আরো ব্যাপার আছে—খবর লিন—খবর লিন—দেখুন, এখন ওদের কে উস্কানি দিচ্ছে।"

তর্জ্জনীর আঘাতে টার্কিশ সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ফেলে মিঃ বাসু বলল, "আচ্ছা।"

নাগরমল—কোটি কোটি টাকার মালিক নাগরমল। কুবেরের মতই যার ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার আর ভুঁড়ি। সেই নাগরমলের বিরুদ্ধে কে উস্‌কাচ্ছে মজুরদের? ত্রিলোচনের শূন্য স্থান কে পূরণ করল?

নাগরমল অতিরিক্ত ভাতা দিচ্ছে না, কাজে 'নাগা' হলে মাইনে কাটে সে। তার এই জুলুমের বিরুদ্ধে মজুরেরা রুখে দাঁড়াল। কি করে সম্ভব হল তা? আজ ত' ত্রিলোচন নেই, সে আজকাল আহত পশুর মত শুধু আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু আছেন জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য। জাগ্রত শ্যামরায়ের একনিষ্ঠ পূজারী—যাঁর আগুনের মত টক্‌টকে দেহবর্ণে দেবতার জ্যোতিঃশিখা, মাথার কেশে যাঁর অনেক জ্ঞানের শুভ্রতা।

"ঠাকুর—বড় অত্যাচার হচ্ছে"—

"কি অত্যাচার? কার?"

"মালিকের।"

"কি হল ?" জনার্দ্দন বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

মজুরেরা সব নিবেদন করল।

জনার্দ্দন প্রথমে শ্যামরায়ের দিকে তাকালেন, তারপরে তাকালেন ভক্তদের দিকে, বললেন, "এর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াও, লড়াই কর তোমরা—শ্যামরায় তোমাদের সহায় হবেন।"

নব-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল মজুরেরা, তাদের চোখগুলো জ্বলে উঠল।

কিন্তু আড়ালে ত্রিলোচন বিকৃত হাসি হাসল। পণ্ডিতও আজ তার পথ ধরেছে, কিন্তু শ্যামরায়ের দোহাই কেন ? কেন, কেন ঐ পাথরটার দোহাই ? পাথর—হ্যাঁ, পাথরই ত। তার চোখ দিয়ে এবার আগুন ঠিকরে বেরোয়। মনে পড়ে নিজের জীবনের কথা। স্ত্রী, পুত্র, সংসার, আশা—সব ছিল ত্রিলোচনের। একচক্ষু ত্রিলোচনের দুটো চোখই ছিল। আর—আর সে এককালে পাথরেও দেবতাকে খুঁজত। কিন্তু দেবতাকে ডেকেও যখন স্ত্রী গেল, পুত্র গেল, সংসার হাওয়ায় মিলাল, আশা শুধু ছাই হল, দু'চোখের একটা গলে গেল, তখন থেকেই ত্রিলোচনের জ্ঞান হল, একচোখেই সে পূর্ণ দৃষ্টি পেল। ভুল ভেবেছিল সে, এত দিন মিথ্যে সে বাতাসে প্রার্থনা ভাসিয়েছে, মিথ্যে সে লবণাক্ত অশ্রুরাশি বর্ষণ করেছে। ব্যাধি, দারিদ্র্য, দুরদৃষ্ট—পাথরের মূর্ত্তি কোনটাতেই কাজে লাগে না। পাথর পাথরই আর কিছু নয়। অতএব ? কেন ঐ পাথরটার দোহাই ?

ত্রিলোচন না বুঝলেও নাগরমল বুঝল সেকথা। বুঝল যে নেতৃত্ব নয়, ব্যক্তিত্ব নয়—এখন একটা পাথরের মূর্ত্তিই ওদের উস্‌কাচ্ছে। হঠাৎ বুদ্ধির জগতে বিদ্যুতের মত একটা কথা ঝলসে উঠল।

"বাসুবাবু।"

"বলুন।"

"শহরের সেরা ইঞ্জিনীয়ারকে ডাকুন।"

"কেন?"

"কাজ আছে।"

"কিন্তু শেঠজী—একটা কথা আছে। মজুরেরা যে আবার বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে—স্ট্রাইক করবে বলে শাসাচ্ছে"—

"কোনও ভাবনা নেই, আপনি ইঞ্জিনীয়ারকে ডাকুন আর চারদিকে রাষ্ট্র করে দিন যে ঐ শ্যামরায়ের মন্দিরের কাছেই বিরাট একটা মন্দির গড়ব আমি।"

"মন্দির! মানে টেম্পল?" বাসুর গলায় টার্কিশ সিগারেটের ধোঁয়া যেন আটকে গেল।

"হ্যাঁ, মন্দির। কেন, আপনি কি ঠাকুর-দেব্‌তা মানেন না?"

"নিশ্চয়ই, Sure—মানি বইকি।"

"তবে যান—"

সবাই শুনল সেকথা। কোটি কোটি টাকার পাহাড়ের উপর যে নাগরমল বসে আছে, সে যদি আজ চার লাখ টাকা দিয়ে একটা মন্দির গড়ে তোলে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

কিন্তু তবু আশ্চর্য্য হয় মজুরেরা। নাগরমল লোকটার ত ভক্তি আছে! কোটি কোটি টাকা থাকলেই বা দেবতার জন্য লাখ লাখ টাকা ক'জন খরচ করে? এটা কম কথা নয়। শুধু আশ্চর্য্য নয়, মুগ্ধ হয়ে যায় মজুরেরা।

কিন্তু কোন্ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করবে নাগরমল? কেউ তা জানে না।

শুধু নাগরমল জানে সেকথা।

সন্ধ্যার পরে জনার্দ্দন এসে নাগরমলের কাছে হাজির হলেন। নাগরমল তাঁর পদধূলি মাথায় নিল, বিনয়াবতার হয়ে বলল, "বসুন পণ্ডিতজী—"

জনার্দ্দন প্রশ্ন করলেন, "কি জন্যে ডেকেছেন শেঠজী ?"

ক্ষণকাল নিঃশব্দ থেকে নাগরমল বলল, "খোলাখুলি বলব পণ্ডিতজী ?"

"বলুন।"

"আমি মন্দির করছি, জানেন ?"

"শুনেছি—খুব সাধু সঙ্কল্প আপনার।"

"আমি ঐ মন্দিরে আপনার শ্যামরায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।"

"পাগল!" জনার্দ্দন সহাস্যে উঠে দাঁড়ালেন। পৃথিবীতে আজ কেউ নেই জনার্দ্দনের। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, ঐশ্বর্য্য—সব কিছুই আজ ঐ শ্যাম-রায়! একের পর একটা করে পার্থিব সম্বন্ধ যতই বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ততই জনার্দ্দন বুঝতে পেরেছেন যে, এই বিরাট বিশ্ব-জগতে একমাত্র শ্যামরায় ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। সেই শ্যামরায়কে তিনি অন্যের হাতে সঁপে দেবেন! পাগল!

নাগরমল গম্ভীরকণ্ঠে বলল, "উঠবেন না, বসুন—কথাটা উড়িয়ে দেবেন না। আপনার মন্দির প্রাচীন, আমার নূতন মন্দিরে নববেশে শ্যামরায় বিরাজ করবেন, আর আপনিই তাঁর পূজারী হবেন—"

"না।"

"কিন্তু কেন ?"

"বড়লোকের প্রাসাদে গেলেই দেবতার মাহাত্ম্য বাড়ে না। তাছাড়া শ্যামরায় আমার—আমার বুকের পাঁজরা—"

"কিন্তু আপনার জীর্ণ মন্দির—"

"জীর্ণতাই ত' তার মাহাত্ম্য—"

নাগরমল হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "পণ্ডিতজী—"

"কি ?" জনার্দ্দনের চোখ জলজল করছে।

"টাকা দেব আপনাকে—"

"চাই না—"

"হাজার—পাঁচ হাজার—"

"না।"

"দশ হাজার—"

জনার্দ্দন হাসলেন, "টাকা দিয়ে ভগবানকে কেনা যায় ? না, আর না, আমি চললাম শেঠজী—"

আর কোন কথা না বলে, কোন উত্তরের প্রত্যাশা না করে জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করে দেয়ালঘড়ির টিক টিক শব্দটা শোনা যেতে লাগল, একটা অর্বাচীনের খিক খিক হাসির মত।

জনার্দ্দনের গমন-পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নাগরমলের ধবধবে সাদা ললাটদেশে আঁকাবাঁকা কালসাপদের দেখা গেল। একটা ক্রুর বীভৎসতায় হঠাৎ তার মুখমণ্ডলটা ভয়ানক হয়ে উঠল।

বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনীয়ার এসেছে। এসেছে সব ওস্তাদ কারিগরেরা। জয়পুর থেকে পাথর এসেছে, বাঙলা বোম্বাই থেকে শিল্পীরা। নাগরমলের বিরাট মন্দির যেন মানুষদের ভক্তি-অনলে ইন্ধন জোগায়।

তাই হল। ছ'মাসের মধ্যে বিরাট মন্দির গড়ে উঠল। শ্বেতপাথর আর কষ্টিপাথরের মেঝে, প্রাচীরগাত্রে পৌরাণিক দেবদেবীদের অপূর্ব্ব চিত্র-কাহিনী। চন্দনকাঠ, সোনা আর রূপো দিয়ে বিগ্রহের সিংহাসন নির্ম্মিত হল, দেবতার পরিচ্ছদের জন্য এল দামী দামী রেশম। মনে হল যে বৈকুণ্ঠের বিষ্ণুকেও বুঝি টলানো যাবে।

মনের বিদ্রোহ দমিত হয়। অভ্রভেদী মন্দিরের ধোঁয়াটে চূড়াকে দেখে ভয় হয়, ভক্তি হয়, দেবতার কথা, দেবতার অপ্রতিহত ক্ষমতার কথা মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নাগরমলের উপর রাগটা যেন কমে আসতে চায়।

আড়ালে ত্রিলোচন মনে মনে গর্জ্জায়। অন্ধ, ওরা অন্ধ। আফিংয়ের

নেশায় আচ্ছন্ন, সম্মোহিত হয়ে আছে ওরা। ওরা অসহায়, নিজেদের অপরিসীম ক্ষমতার কথা জানে না বলেই ওরা অমনভাবে মাথা খোঁড়ে।

রাত হয়েছে তখন। শ্যামরায়ের পূজা, আরতি, ভোগ, শয়ান সব শেষ করে জনার্দ্দন বাড়ী ফিরছিলেন। একশ' বছরের শ্যামরায়ের মন-ভোলানো হাসিটা তখনো তাঁর চোখের সামনে ভাসছিল।

এমনি সময়ে কালো যবনিকা নেমে এল।

অন্ধকারের মাঝখান থেকে সজোরে একটা রামদা এসে তাঁর ঘাড়ে পড়ল। কোনো কিছু ভাববার আগে, 'শ্যামরায়' বলে ডাকবার আগেই জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্যের মাথাটা তিনহাত দূরে ছিটকে পড়ল। মাটিতে ইঁট পড়লে যেমন শব্দ হয় রাম দত্তদের বাগানে তেমনি একটা শব্দই শুধু শোনা গেল আর লাল রক্তের মদির গন্ধে রাতের অন্ধকার বিহ্বল হয়ে উঠল। আর কিছু নয়।

তারপরেই হঠাৎ একদিন এক অপূর্ব্ব কাহিনী শোনা গেল।

শ্যামরায়ের মন্দিরকে এখন যারা দেখা-শোনা করছিল নাগরমল তাদের ডেকে পাঠাল।

দীনভক্তের মত নম্রভাবে, বিনীতকণ্ঠে সে তাদের এক বিচিত্র স্বপ্নকথা বলল। কাল রাতে সে স্বপ্ন দেখেছে। দেখেছে যে শ্যামরায়—জাগ্রত দেবতা শ্যামরায় যেন তাকে করুণকণ্ঠে মিনতি করে বলছেন, "আমায় নিয়ে যা নাগর—আমায় এ ভাঙ্গা মন্দির থেকে উদ্ধার কর—সবাইকে বল্"—

শ্রোতাদের দেহ কদম্বফুলের মত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

"আপনারা এবার আমায় কি করতে বলেন ?" মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল নাগরমল। একমুহূর্ত্ত চুপ করে রইল ওরা, তারপরেই সবাই সম্মিলিত-

কণ্ঠে বলে উঠল, "নিয়ে যান, শ্যামরায়কে আপনার মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত করুন শেঠজী—"

নাগরমলের কণ্ঠে আবেগ, চোখে জল। সে বলল, "আমি ধন্য হলাম। তবে ও মন্দিরকেও সারিয়ে দেব আমি, নূতন মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করব ওখানকার শূন্য সিংহাসনে—যা টাকা লাগে—আমি, আমি দেব তা।"

সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল এই দিব্য কাহিনী।

প্রেতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল যে ত্রিলোচন তার কানেও একথা গেল। মুহূর্ত্তে সে আজ শ্যামরায়ের ক্ষমতাকে উপলব্ধি করল—কি অদ্ভুত সে ক্ষমতা!

থুথু ফেলে সে গাল দিয়ে বলল, "শালা—প্যাঁচার বাচ্চা"—

তারপরে একদিন মহাসমারোহে নাগরমলের মন্দিরে শ্যামরায়ের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। সেদিন পাটকল বন্ধ রইল, মজুরেরা ছুটি পেল।

আঃ, কি অপরূপ দেখাচ্ছে শ্যামরায়কে।

তখন সন্ধ্যারতি হচ্ছিল। শ্যামরায়ের বয়স হয়েছে—একশ' বছর—তবু বার্দ্ধক্যবিহীন প্রস্তরের মাঝে অনন্তকালের কৈশোরকে যেন শিল্পী অমর করে তুলেছে। সোনা, রূপো, জরি, রং আর আলোর উৎসব। কে এককোণে ধ্রুপদ গাইছিল—তার সঙ্গে একজন ঝাঁপতালে পাখোয়াজ বাজাচ্ছে—সেই গুরু গুরু শব্দে মন্দির যেন মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে। বহু বছরের বুভুক্ষু শ্যামরায় তাঁর কোটিপতি ভক্তের অর্ঘ্যের দিকে তাকিয়ে আছেন—তাঁর রসনায় জল এসেছে, তাঁর পরিপুষ্ট ও ধনুকের মত বাঁকা ঠোঁটের কোণে চঞ্চল কিশোরের দুষ্টামিভরা হাসি। অপরূপ!

ত্রিলোচন জ্বলে পুড়ে মরে। কি করে ওদের জাগানো যায়?

দিনের পর দিন কাটে।

কি করে, কি করে ওদের জাগানো যায়?

আবার সেই এক ইতিহাস। ব্যাধি, মড়ক, দারিদ্র্য। শ্যামরায় বাঁচাও, রক্ষা করো। চরণামৃত আর তুলসী চন্দন। প্রস্তরের আশীর্ব্বাদ। আফিং খেয়ে ঝিমোয় সবাই। আর সেই অবসরে নাগরমলের ভুঁড়ি বাড়ে, ধীরে ধীরে রসিয়ে রসিয়ে সে হতভাগাদের গলা কাটে। আজ আর ভয় নেই—আজ নাগরমল সেই শ্যামরায়ের পূজারী—যে জাগ্রত শ্যামরায় মজুরদের অনাহার থেকে বাঁচান, মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন, দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করেন।

অসহায়ভাবে ছট্‌ফট্ করে ত্রিলোচন। কি করা যায় কি করা যায়? কি করে ওদের জাগান যায়?

আগুন।

শেষরাতে কোলাহল ধ্বনিত হল।

ছুটে এল শত শত মজুর।

"আগুন—শ্যামরায়ের নতুন মন্দিরে আগুন লেগেছে—"

"কেরোসিন তেল আর পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়েছে কেউ—"

"দমকল ডাকো—ফোন করো—"

"শ্যামরায়কে উদ্ধার করো—"

এমনি সময়ে ছুটে এল ত্রিলোচন। তার একচোখ উত্তেজনায় জ্বলছে, সে কাঁপছে।

"যাচ্ছি—আমি উদ্ধার করছি শ্যামরায়কে—"

কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে অগ্নিকুণ্ডের ভিতরে ছুটে গেল সে। শ্যামরায়ের প্রকোষ্ঠের শালকাঠের দরজাটা তখন পুড়ে গেছে, আগুন বিস্তৃত হয়েছে ভিতরের দিকে, স্পর্শ করেছে সিংহাসনকে।

ভয়াবহ বীভৎসতায় কুটিল হয়ে উঠেছে ত্রিলোচনের মুখমণ্ডল। দুটো হাত বাড়িয়ে সে শ্যামরায়কে তুলে নিল।

মৃদু, মোলায়েম কণ্ঠে সে বলল, "একশ' বছর বয়েস হয়েছে তোমার—আর বেঁচে লাভ নেই শ্যামরায়—"

শ্বেতপাথরের মেঝের উপর কষ্টিপাথরের কিশোর মূর্ত্তিটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

আগুনের ঝাপ্‌টা এসে চামড়ায় লাগছে, পড়ছে ফোস্কা, তবু হাসল ত্রিলোচন। আঃ, আজ সে তৃপ্ত।

সমস্ত মন্দিরে তখন দীপান্বিতা উৎসব শুরু হয়েছে, কাঠের দরজা জানালার চটাচট্ শব্দ শোনা যায়। শ্যামরায়ের সোনা রূপো দিয়ে মোড়া চন্দনকাঠের সিংহাসনটা তখন কাগজের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাতাসে চন্দনের একটা সুতীব্র সুঘ্রাণ।

লেলিহান হয়ে উঠেছে—ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষসের মত চমৎকার আহার্য্য পেয়ে সেই অগ্নিরাশি যেন পরিতৃপ্তির রাক্ষসী নিঃশ্বাস ফেলছে। আঃ—আঃ। ধোঁয়া উড়ছে, আগুনের সর্প-জিহ্বা বাতাসকে লেহন করছে, ত্রস্ত, ব্যস্ত, ভয়ার্ত্ত মজুরেরা দৌড়োদৌড়ি করছে।

বেরিয়ে এল ত্রিলোচন। জামা কাপড় পুড়ে গেছে, অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দগ্‌দগে ঘা আর ফোস্কা নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এল ত্রিলোচন।

মজুরেরা সবাই ছুটে এল কাছে।

"পারলাম না—ভাইসব, পারলাম না—" বিচিত্র হাসি হেসে বলল ত্রিলোচন।

সবাই তাকাল ত্রিলোচনের দিকে। তাকে দেখে তাদের ভয় হয়, ভক্তি হয়। শ্যামরায়কে উদ্ধার করা গেল না! হঠাৎ ওরা দুর্ব্বলবোধ করে। এবার? এবার কি হবে?

"ত্রিলোচন—কি করি তবে?"

"কিছু না—শুধু দেখ্—দেখ্ কি চমৎকার আগুন জ্বলছে—"

স্থির হয়ে দাঁড়াল সে। ঘা, ফোস্কা—কিছু যায় আসে না। সেই ভীতিজনক আগুনের আলো এসে তার মুখের উপর পড়েছে, বসন্তের দাগে বিকৃত মুখমণ্ডলের উপর এক বিচিত্র বীভৎস হাসির রেশ। আগুনের অপরূপ দীপ্তির দিকে তাকিয়ে সে মুগ্ধ হয়ে গেছে। পুড়ুক, শ্যামরায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হোক। মিষ্টি চেহারার অন্তরালে পাথরের মত নিষ্ঠুর ও নির্লিপ্ত মন যে শ্যামরায়ের তার অনেক বয়স হয়েছে —শ্যামরায় মরুক। দেবতারা সব রক্তবীজের মতো—মরেও মরে না। দেবতারা না মরুক, অন্ততঃ শ্যামরায়ের মত দেবতারা মরুক। শ্যামরায়কে আর নয়। নূতন দেবতা চাই এবার—যাঁকে টাকা দিয়ে কেনা যাবে না, যাঁকে বিশ্বাস করার জন্য বুদ্ধি ও মানবত্বকে বলি দিতে হবে না।

এক চোখ—মাত্র একটা চোখ ত্রিলোচনের। ডান চোখটা তার বসন্তের ঘায়ে গলে গেছে, গায়ে তার ঘা আর ফোস্কা, তবু তার মুখে আজ পরিতৃপ্ত শ্বাপদের উল্লাস। একটা চোখ—মাত্র বাঁ চোখটা আছে তার। আর সেই বাঁ চোখের উপর সেই অগ্নিলীলার আলো এসে পড়েছে—ঝক্‌ঝক্ করছে সেটা—অনির্ব্বাণ সূর্য্যকান্ত মণির মত।

আজিজ চুপ করেই রইল। জোহরাকে সে চেনে, সে জানে যে জোহরা যখন রেগে যায় তখন তাকে কিছু না বলাই ভাল, এমনকি সে যদি অন্যায় কথাও বলে তবু তা নীরবে শুনে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখে যারা বড় হয় তারা দুঃখে, অভাবে, স্বপ্নশেষের ব্যর্থতায় মাথা ঠিক রাখতে পারে না। জোহরারও ঠিক সেই অবস্থা। শৈশবে, কৈশোরে সে লায়লা মজ্নুর, শিরি ফরহাদের কাহিনী পড়েছিল, পড়েছিল আরব্য-রজনী ও হাতেম-তাইএর কাহিনী, আর সেই সব কাহিনী পড়ে পড়ে সে মনের মধ্যে হাওয়াই কেল্লা তৈরী করেছিল, অনেক অসম্ভবকে তার জীবনে সম্ভব হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু বেচারা আজিজ, ট্রামের কন্ডাক্টর আজিজের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার পর থেকে সেই হাওয়াই কেল্লা হাওয়াতেই মিলিয়ে গেছে, সেই সব বহুবিচিত্র স্বপ্ন আজ ধোঁয়ার মত কোথায় উড়ে গেছে।

তবু চলছিল। বাস্তব যতই রূঢ় হোক, অসহ্য হোক, বেঁচে থাকার একটা আনন্দ আছে। কঠিন পরিশ্রমের পর, বস্তীর একটা স্বল্প-পরিসর নোংরা ঘরে, কেরোসিনের ডিবার ধোঁয়াটে অস্পষ্ট আলোতে জোহরার অতীত স্বপ্ন আজিজের চোখেই ঘনায়। আজিজ অবাক হয়ে যায়। একি স্বপ্ন দেখছে সে! জোহরা কি সেই সব বিচিত্র কাহিনীরই কোনো একটি নায়িকা! আর তার পাশে তার মেয়ে রাবেয়া যেন বেহেস্তের একটা ছদ্মবেশী পরী। আশ্চর্য্য! আর জোহরা! অবশ্য স্বপ্ন দেখে না সে, অল্প আয়ের সংসারের খুঁটিনাটি তো আজিজ তার চেয়ে বেশী জানে না। সে শুধু জোহরাই জানে যে তিনটি পেট চালাতে আজকালকার এই বাজারে কি বেগ পেতে হয়। তবু চলছিল, গড়িয়ে গড়িয়ে,

থিতিয়ে থিতিয়ে, বেঁচে থাকাটাকেই একটা বড় ব্যাপার মনে করে, পরস্পরকে ভালবেসে।

কিন্তু হঠাৎ সেই বেঁচে থাকার ব্যাপারটাই সন্দেহজনক হয়ে উঠল এবং তা সন্দেহজনক হওয়ায় ভালবাসাটা পীড়াদায়ক হয়ে উঠল, মনে হল যে যাদের আজিজ ভালবাসবে তাদের সে যদি পেট ভরে না খাওয়াতে পারে তাহলে সে ভালবাসা যেন একটা অপরাধ। কেন? স্ট্রাইক—ধর্ম্মঘট! ট্রাম কোম্পানীর শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করেছে। কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের গাফিলতী ও অবিচার আর সহ্য করা যায় না, আর সহ্য হয় না দীনভাবে তাদের হীন প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখা।

ধর্ম্মঘট চলছে। একদিন দু'দিন করে আজ দু'মাস অতিক্রান্ত হতে চলেছে। দিনের পর দিন কাটল, সঞ্চিত যা কিছু ছিল তা প্রায় ফুরিয়ে এল, অবশেষে দিন পনেরো বাদে পেটে টান পড়ল। তখন অনন্যোপায় হয়ে আজিজ একটা কাজ শুরু করল। যা কিছু শেষ সম্বল ছিল তাই দিয়ে সে কিছু মনিহারী জিনিষ কিনে শিয়ালদার মোড়ে গিয়ে ফুটপাথের ওপর বিছিয়ে বসল, হিসেব করে দেখল যে দৈনিক টাকাখানিক লাভ হলেই তার বেশ চলে যাবে। তাছাড়া উপায় কি, ধর্ম্মঘট যে অনেকদিন চালাতে হবে তা তারা বুঝতে পারছে, তাছাড়া অন্যান্য সবাই কিছু না কিছু একটা উপার্জ্জন করার চেষ্টায় আছে। বাঁচতে হবে তো, অন্ততঃ এই ধর্ম্মঘটটায় জিৎবার জন্যই বাঁচতে হবে।

তবে মাঝে মাঝে মনে একটা প্রশ্ন জাগে—কতদিন? মালিকেরা এবার ভেবেছে যে যতদিন লাগবার লাগুক, না খাইয়েই শ্রমিকদের তারা শায়েস্তা করবে। তাই প্রশ্ন জাগে মনে—কতদিন? আর আজ জোহরা যে সব কথা উত্তেজিত ভাবে তাকে বলছে তারও মধ্যে ঐ একই প্রশ্ন বারংবার ধ্বনিত হচ্ছে। কতদিন, আর কতদিন?

জোহরা হঠাৎ থামল, কি ভেবে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, "কাল বিশ তারিখ, হ্যায় না ?"

"হাঁ।"

"কাল সব্‌কো কাম্‌মে শরিক হোনেকা ওয়াস্তে কম্পানী নে নোটিশ জারী কী হ্যায় ?"

"হাঁ"—আজিজ জোহরার কথার মোড় ঘুরে যাওয়ায় অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

"তব্‌ তুম্‌ যা রহে হো না ?"

মাথা নাড়ল আজিজ, কথার মোড় আবার ঘোরাবার জন্য সে রাবেয়াকে ডাক দিল, "বেটি—এদিকে আয়, আয়—"

পাঁচ বছরের রাবেয়া তখন একটা কাপড়ের পুতুল নিয়ে খেলা করছিল। বহুদিনের পুরোনো পুতুল, ছিঁড়ে গেছে, তবু তাই নিয়েই খুশী আছে রাবেয়া। সেই পুতুলকে নিয়েই তার সময় কেটে যায়, সারাক্ষণ সে তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যে বাপ তাকে চোখের মণির চেয়েও দুর্মূল্য মনে করে তাকেও অনেক সময় ভুলে যায় রাবেয়া। আজিজ হাসল মেয়ের আত্ম-সমাহিত ভাব দেখে।

"এদিকে আয় বেটি—ইধার আ"—আজিজ আবার ডাকল।

কিন্তু জোহরা স্বামীর মাথা নাড়ার অর্থ বোঝে নি। এমনভাবে মাথা নেড়েছিল আজিজ যার অর্থ একসঙ্গে 'হ্যাঁ' এবং 'না' হতে পারে। বাঁকা ভুরু দুটোকে আরো কুঁচকে সে আবার জিজ্ঞেস করল, "ক্যা, তুম নেহি যাও গে ?"

আজিজ এবার সোজা তাকাল স্ত্রীর দিকে, মৃদুকণ্ঠে বলল, "নেহি।"

"লেকিন কিঁউ ?"

মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আজিজ বলল, "কিঁউ তুম্‌ তো জান্‌তি হো ?"

"তোমরা হার মানবে না এই তো ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু ক'দিন চলবে এমনিভাবে ? ক'দিন ?"

"যতদিন চলবার চলুক—যতদিন ওরা হার না মানে ততদিন।"

"তব্ খাওগে ক্যা ?" জোহ্‌রা এবার চেঁচিয়ে উঠল, যেন চেঁচিয়েই সে স্বামীকে হার মানাবে, ট্রাম কোম্পানীর কাছে তার স্বামী হার মানে না বলে যে তার কাছেও হার মানবে না একথা ভাবতে জোহ্‌রার রাগ আরো বেড়ে যায়। সে না হয় বুঝল সব কিন্তু কথায় হার মানতে দোষ কি ?

কিন্তু জোহ্‌রার চিন্তাটা তো সরব নয় তাই আজিজ ওধার দিয়ে গেলই না, বলল, "কেন তোমায় কি না খাইয়ে রেখেছি ?"

জোহ্‌রা অবাক হবার ভান করল, "এমনিভাবে রাস্তায় রাস্তায় জিনিষ বিক্রি করে বেড়াবে—পেট ভরবে তাতে ?"

আজিজ হাসল, "না হয় আধপেটা খাবে।"

কথা খুঁজে পেল না জোহ্‌রা, খানিকক্ষণ ক্রোধে সে চুপ করে রইল, দুটো চোখে যেন আগুন জ্বলতে লাগল তার, তারপরে বলল, "তব্ তুম্‌হরা যো খাইস্ করো—ভিখ মংগো, ভুখ্‌খে মরো—দিলমে যো হ্যায় বহি করো" —বলেই সে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে নয়, গেল রান্নাঘর বলে যে খুপ্‌রীর মত ছোট্ট ঘরটা সেখানে। সেটাই জোহ্‌রার গোসাঘর।

বিবির যাওয়ার ভঙ্গী দেখে নীরবে হাসল আজিজ। রাগ করতে সে পারল না, একটা কথা বলে জোহরার রাগকে আরো বাড়াবার মত দুঃসাহসও তার হল না, তাই সে শুধু হেসেই থেমে গেল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "কি বেটি তোর পুত্‌লা কেমন আছে ?"

ঘাড় বাঁকিয়ে রাবেয়া গম্ভীরভাবে বলল, "ভাল।"

মেয়ের দিকে পর্য্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে তাকাল আজিজ, পুতুলের মতই রাবেয়ার জামা আর পাজামাটা ছিঁড়ে গেছে, লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা রুক্ষ

চুলগুলো দেখে বুকটা হুহু করে তার। ছোট একটা নথ-লাগানো ময়লা মুখটায় একজোড়া জলজ্বলে তারার মত দুটো চোখ। আর দুটো লালচে ঠোঁট। আজিজের দরিদ্র সংসারে একটিমাত্র ঐশ্বর্য্য ঐ মেয়েটা। প্রথম যৌবনের সেই উচ্ছল, রঙীন দিনগুলো আর নেই, তখন জোহ্‌রাই ছিল সব। আজকাল রাবেয়াই সব। অথচ—

"বেটি—"

"আব্বাজান ?"

"তোর একটা নতুন পুতুল হলে বেশ হয়, তাই না ?"

"হ্যাঁ"—খুব মৃদুকণ্ঠে বলল রাবেয়া।

"দেব, শিগগিরই এনে দেব তোকে। যেদিন আমাদের ধর্ম্মঘট থামবে সেদিন আমার প্রথম কাজ হবে তোকে একটা নতুন পুতুল এনে দেওয়া, বুঝলি ?"

রাবেয়ার দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বাপের গলা জড়িয়ে ধরে সে বলল, "সত্যি ?"

"হাঁ বেটি—জরুর। আচ্ছা তখন এই পুরোনো পুতুলটা দিয়ে কি করবি ? ফেলে দিবি ?"

রাবেয়া চট করে জবাব দিল না। সে তাকাল ছেঁড়া পুতুলটার দিকে, একবার হাত বুলোল তার গায়ে, পরে মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু, নেহি। এও থাকবে, নতুনটাও থাকবে।"

এতদিনকার পুতুলটা—সুখদুঃখের কত মুহূর্তের সঙ্গী! আজ 'একটা নতুন পুতুল এলেই কি এর দাম কমে যাবে! উঁহু। রাবেয়া অকৃতজ্ঞ নয়। না, পুরোনোটাও থাকবে, নতুনটাও থাকবে।

"আচ্ছা বেটি—তুই খেলা কর, আমি এবার যাই।"

"কাঁহা আব্বাজান ?"

"কুছ রুজি রোজগার কা বন্দোবস্ত করনে"—তারপরে সে তার

হারেমের গোসাঘর মানে সেই খুপ্‌রীর মত রান্নাঘরটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, "আ জী শুন্‌তি হো ?"

জবাব এল, "নেহি ।"

"খপা ন হো বিবি--ম্যয় চল্‌তা—"

জবাব নেই।

"শুনা জী—রাবেয়াকা বাপনে আব চলা—"

জবাব এল, "ম্যয় নেহি শুন্‌তি—"

আজিজ সশব্দে হেসে বলল, "ব্যস্‌ ব্যস্‌, কাফি শুনি—অব ম্যয় চলা।"

ঘরের কোণ থেকে হুটো বড় পোঁটলা মত তুলে নিয়ে সে একবার মেয়ের চিবুকটা ধরে নেড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আজ পেছন পেছন জোহ্‌রা এগিয়ে এল না, কিন্তু পাঁচ বছরের রাবেয়া তার ছেঁড়া পুতুলটাকে বাঁ হাত দিয়ে বুকে চেপে ধরে এগিয়ে এল দরজা পর্য্যন্ত। দরজায় হেলান দিয়ে সে ঠিক মায়ের ভঙ্গীতেই তাকাল বাপের গমন পথের দিকে। তার কচি মুখে একটা গম্ভীর ভাব, যেন তার বয়স নেহাৎ কম নয়, যেন মানুষের হুঃখ কষ্টের সমস্ত ইতিহাসই সে জেনে ফেলেছে।

চলতে চলতে একবার পেছন ফিরে তাকাল আজিজ। নেহাৎই অভ্যাস। তাকিয়ে সে যা দেখল তাতে তার বুকটা ফুলে উঠল, দুলে উঠল, চোখে জল এল। তার আর দুঃখ করার নেই। অনেক দুঃখ পেয়েছে সে, অনেক লড়াই করেছে, হয়ত আরো দুঃখ পাবে, আরো লড়াই করতে হবে। কিন্তু সমস্ত দুঃখের মাঝে একটা অপরূপ ফুল ফুটেছে তার জীবনে। ঐ মেয়েটা। তার দেহেরই একটা অংশ। কাঁটার বেদনাকে যেমন একটা রক্তগোলাপ ভুলিয়ে দেয় তেমনিভাবে ঐ মেয়েটা তার দুঃখদীর্ণ জীবনকে সার্থক করে তুলেছে। জোহ্‌রার পরে আর একজন তবে দেখা দিয়েছে যে আজিজকে ভালবাসে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।

শিয়ালদা আর বৌবাজারের মোড়ে গিয়ে বাঁদিককার ফুটপাথের একপাশে আজিজ বসল, পোঁটলাছুটোকে খুলে বিছোল, জিনিষপত্রগুলোকে সাজাল। পেন্‌সিল, ব্লেড, ন্যাপ্‌থালিন, ছুঁচ, বোতাম, খেলনা, বল, উর্দ্দুতে লেখা ছোট ছোট গান আর গল্পের বই, চিরুণী, জুতোর কালি, জিভছোলা এমনি নানা জিনিষ। লাইসেন্স নেই, তবে টহলদারী পুলিশদের দু'এক আনা দিলেই সব ঠিক থাকে।

তার আশেপাশে আরো নানা রকমের বিক্রেতা। জুতো পালিশ করনেওয়ালা দু'জন, একজন লুঙ্গি-বিক্রেতা, দু'তিনজন কমলালেবু বিক্রি করছে, একজন একঝুড়ি ডাব নিয়ে বসেছে, এমনি আরো কয়েকজন আছে। সারা জীবন ধরে, দিনের পর দিন ওরা এমনি ফুটপাথে বসে জিনিষ বিক্রি করে, সংসার চালায় এমনি জীবিকাকে অবলম্বন করে। ওদের কোনো ঘর নেই, মাথার ওপর নেই কোনো আচ্ছাদন, গ্রীষ্মের আগুন আর বর্ষার জল দেখে ওদের জীবন-সংগ্রাম থেমে যায় না। সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে, ভেঙ্গে চুরে, ওরা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে।

খেয়ে দেয়ে এসেছে আজিজ। একেবারে সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরবে বলে ওপাট সে চুকিয়ে বেরিয়েছে। এখন আফিসটাইম। জনস্রোত ক্ষিপ্রগতিতে বয়ে চলেছে। মানুষের জীবন-নদীর এ এক বিচিত্র রূপ। বাসে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে সবাই, জায়গায় কুলোচ্ছে না। সে অবস্থাতেও গেলে তো হোত কিন্তু তাই বা হচ্ছে কোথায়? বেশীর ভাগ লোকই হেঁটে যাচ্ছে। প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতেই বলা চলে। কেন? আগে তো এমন হোত না, শতকরা প্রায় নব্বইজন লোকই কোনো না কোনো কিছুতে চড়ে যেত। তবে? আজিজ তাকাল রাজপথের দিকে। ট্রামলাইন। দু'মাস আগে সেগুলো চক্‌চক্ করত এ সময়টাতে, তার খাঁজে খাঁজে আজ ময়লা, আজ তার দীপ্তি অন্তর্হিত। আজিজ তার বুকের ওপর হাত

রাখল। সেফটিপিনে আঁটা একটা লাল কাগজ—তাতে লেখা ‘ধর্ম্মঘটী ট্রামশ্রমিক’। আজ ট্রাম চলছে না, দু’মাস ধরে চলছে না। লক্ষ লক্ষ নাগরিকের সেবা করেও তারা সসম্মানে বাঁচতে পারছে না বলে আজ ট্রাম চলছে না। আজ ইলেক্‌ট্রিকের তারে বিদ্যুতের আগুন জ্বলছে না, পিচের পথ কাঁপছে না, শব্দ উঠছে না—ঘটাং ঘট্ ঘট্ ঘট্, ঘণ্টা বাজছে না—টং টং টং। আজ সব শান্ত, স্তব্ধ। শুধু বাসগুলো একা তাল সামলাতে গিয়ে ক্ষ্যাপার মত ছুটোছুটি করছে, রিক্‌শাওয়ালারা গলদ্‌ঘর্ম্ম হচ্ছে, ঘোড়ার-গাড়ী আর ট্যাক্সি যা ইচ্ছে তাই দর হাঁকছে। আজ সব নীরব। ট্রাম চলছে না। এবং তাদের সম্মান না করলে ট্রাম চলবেও না, একটাও না।

জিনিষপত্রের সামনে চুপ করে বসে থাকে আজিজ। বড় অদ্ভুত লাগে তার এই নতুন বৃত্তিটাকে। অন্যমনস্কভাবে সে তাকায় চারদিকে। অনতিদূরে শিয়ালদা স্টেশন। তার ওপরকার আকাশে কালো ধোঁয়া মিলিয়ে যাচ্ছে। একটা ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ শব্দ। শিয়ালদা ট্রামডিপোর দেয়ালের পাশে একটা মস্ত বড় বিজ্ঞাপন—তাতে একটি সুদর্শনা নারীর মুখ। ও ফুটপাথের একজন ফলওয়ালা তার আপেলগুলোকে মুছ্‌চে। বেলা বাড়ছে। চৈত্রমাসের রোদ যেন উত্তপ্ত ছোরার মত।

“ওহে, পেন্‌সিলগুলো কত করে?”

আজিজের চমক ভাঙ্গল। একজন ক্রেতা।

এমনি আরো অনেকে আসে।

“ব্লেডের প্যাকগুলো কত করে—ঐগুলো?”

“এক টাকা—”

“এক টাকা! বল কি হে—এ্যাঁ?”

এমনি আরো অনেক ক্রেতা আসে। কেউ কেনে, কেউ কেনে না।

সময় কেটে যায়। একটা দুটো জিনিষ বিক্রি করে আজিজ, আবার অন্যমনস্ক হয়ে তাকায় চারদিকে। বেলা বাড়তে থাকে। অফিস টাইমের

ভীড় একটু কমেছে—তবু জনতা কম নয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে রৌদ্রের প্রাখর্য্য আরো বেড়ে যায়, তেলের মত ঘাম বেরোয় সারা গা দিয়ে, জ্বালা করে, কানদুটো গরম হয়ে ওঠে। সংগ্রাম। একটা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার জন্যই এই সংগ্রাম করছে আজিজ এবং তার সহকর্ম্মীরা। কুড়ি তারিখ। কোম্পানী নোটিশ দিয়েছে যে ঐ তারিখে যারা যারা যোগ দেবে না তারা বরখাস্ত হবে। নীরবে হো হো করে হাসে আজিজ। তাকায় পেছনকার দেয়ালের দিকে, যার ওপর প্রাচীরপত্রে লেখা আছে যে দালাল দিয়ে ট্রাম চলবে না, ট্রাম জ্বলবে। গুলিবারুদকে ভয় করে না তারা, দরকার হলে ঐ লোহার লাইনের ওপর রক্তের বাঁধ তৈরী করবে তারা। সত্য জয়ী হবেই, ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবেই।

"দো দো আনা লে যানা, মিঠা কেঁওলা খা যানা—"

আজিজ তাকাল। একজন কমলালেবু-বিক্রেতা সুর করে আউড়ে যাচ্ছে—ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য। ঝক্‌ঝকে মসৃণ কমলালেবু। আজিজ একটা কিনবে তার রাবেয়ার জন্য। কি রকম খুশী হবে মেয়েটা! কল্পনা করে হাসে আজিজ।

"রস্‌গুল্লাভি হার মানা, শ্বশুরবাড়ী লে যানা, দো দো আনা লে যানা" —একভাবে সুর করে আওড়াচ্ছে লোকটা আর রাস্তার লোকেরা হাসছে তার কথায়।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এলো আজিজের মাথায়। এই সব জিনিষ বিক্রি করে তার যা আয় হয় তাতে আর চলে না। অথচ ধর্ম্মঘট যে কতদিন চলবে তার স্থিরতা নেই। আরো কিছু উপার্জ্জন করতে হবে। কি করে? আচ্ছা, ঐ লোকটার মত সেও যদি কমলালেবু বিক্রি করে? হুঁ, মন্দ হবে না। সে হয়ত চেঁচাতে পারবে না অমনভাবে, তবু কিছু তো বিক্রি হবেই। ঠিক, তাই করবে সে। মনস্থির করে ফেলল আজিজ।

লুঙ্গি-বিক্রেতা অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে ছিল, তার আজ তেমন বিক্রি হচ্ছে না। আজিজের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "বড় গরম, না মিঞা ?"

"হাঁ—"

"হুঁ"—লোকটা স্বল্পভাষী।

খট্ খট্ খট্। হঠাৎ একজন পুলিশ এসে দাঁড়াল পেছনে। কেউ তাকে আসতে দেখেনি, তাই হঠাৎ তাকে দেখে সবাই একটু হকচকিয়ে গেল। পুলিশের এই আকস্মিক উপস্থিতি বড সন্দেহজনক ব্যাপার তাদের কাছে। আর সব চেয়ে বেশী ঘাবড়াল আজিজ।

পুলিশটি বোধ হয় আজিজের মুখ দেখেই টের পেল ব্যাপারটা, সে সোজা তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, "কেঁও মিঞা, লাইসিন্ হ্যায় ?"

আজিজ নিরুত্তরে তার বুকের ওপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করল, যেখানটায় একটা লাল কাগজের উপর ছাপা ছিল, 'ধর্ম্মঘটী ট্রামশ্রমিক'। তারপরে সে হাসল, খুব বিষণ্ণ ভঙ্গীতে, যেন সেই লাল কাগজের টুক্‌রো আর হাসি দিয়ে সে পুলিশকে জয় করবে।

কিন্তু পুলিশটি বিগলিত হল না, রূঢ়ভাবে সে আবার বলল, "উসব না জানেহে, লাইসিন্ দিখলাও না তো—"

অসহায় দৃষ্টিতে আজিজ এদিক ওদিক তাকাল, লুঙ্গি-বিক্রেতার সঙ্গে তার একবার দৃষ্টি বিনিময় হল। হঠাৎ লুঙ্গি-বিক্রেতা এগিয়ে এল।

"এ সিপাইজী—"

"ক্যা—"

"এই দেখেন লাইসেন্স্—"

"উতো তুম্‌হারা—"

"হ্যাঁ, এই জিনিষও যে আমার। ও আমার কর্ম্মচারী—"

পুলিশটি কট্‌মট্ করে খানিকক্ষণ তাকাল লুঙ্গি-বিক্রেতার দিকে,

তারপর আজিজের দিকে, তারপর বিড়বিড় করে কি সব বলে সে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

আজিজ নিঃশব্দে একবার তাকাল লুঙ্গি-বিক্রেতার দিকে, তারপর তার একটা হাত চেপে ধরল, তার চোখে কৃতজ্ঞতার আলো জ্বলে উঠল। লুঙ্গি-বিক্রেতা মৃদু হাসল আর মাথা নাড়ল, কিন্তু কিছু বলল না।

সমস্ত পৃথিবী যেন অপরূপ হয়ে উঠল আজিজের কাছে। না, তারা একা নয়। তারা জিৎবে। সে তাকাল। একটা বাস থেমেছে। একজন ট্রামশ্রমিক চাঁদা সংগ্রহ করছে একটা টিনের কৌটো নিয়ে। দিচ্ছে, লোকেরা সাহায্য করছে। আজিজ হাসল। জিৎবে, তারা জিৎবে। ইংরেজ মালিক তাদের বিরুদ্ধে, স্বজাতি ও স্বদেশী মন্ত্রীরা তাদের বিরুদ্ধে, তবু তারা জিৎবে। কত নির্য্যাতন আর শোষণ করবে ওরা? তুনিয়ায় গরীব আর মজুরই বেশী, তাদের কতদিন দাবিয়ে রাখবে? ধীরে ধীরে তাদের মত সবারই চোখ খুলবে, তাদের সংগ্রাম সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়বে, শেষে একদিন তারাই গড়বে নিজেদের ভাগ্য। আলবৎ জিৎবে আজিজেরা, আলবৎ।

সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরল আজিজ। বৈঠকখানা অঞ্চলের একটা বস্তীর মধ্যে তার ছোট্ট ঘরটা। ঘরের ভেতর কেরোসিনের ডিবা জ্বলছে। গন্ধযুক্ত কেরোসিনের ধোঁয়া আর স্বল্প আলো। তারি মাঝে আজিজ ইন্দ্রজাল ঘটতে দেখে। একটা দড়ির খাটিয়া, ময়লা, ছেঁড়া বিছানা, তু'একটা উর্দ্দু বই, তুটো পুরোনো ক্যালেণ্ডার, দেওয়ালের দড়িতে কয়েকটা পাজামা, লুঙ্গি, সার্ট ও ইউনিফর্ম্ম, তুটো টিনের বাক্স আর কয়েকটা বাসন, কোণে একটা জলের কলসী আর তুটো মগ, একটা বদ্না। ইন্দ্রজাল দেখে আজিজ। কোন্ একটা ভুলে যাওয়া দেশের শাহজাদা সে, এই তার রঙ্মহল, শীষমহল আর ঐ কেরোসিনের ডিবাটা যেন হাজার মোমের বাতির চেয়েও ভাস্বর।

"রাবেয়া"—আজিজ ডাকল।

ছোট ছোট পায়ের শব্দ ধ্বনিত হল, ছুটে এল মেয়েটা তার রুক্ষ চুল দুলিয়ে।

"আব্বাজান্"—মেয়েটা বলল হেসে।

"দেখ্, কি এনেছি বেটি—"

"কি ?"

"চুপ করে দাঁড়া তবে—কেমন ?"

"আচ্ছা—"

পকেট থেকে কমলালেবুটা বের করল আজিজ, তাকাল মেয়ের দিকে, তার দুচোখের ঔজ্জ্বল্যকে লক্ষ্য করে হাসল, তারপর মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিল সে।

"লে বেটি লে—"

কিন্তু মেয়েকে স্পর্শ করেই চমকে উঠল আজিজ। রাবেয়ার গা যেন পুড়ে যাচ্ছে, গরম বালুর মত।

"বেটি ?"

"আব্বাজান।"

"কি হয়েছে তোর ?"

জোহরা এসে ঘরে ঢুকল, মেয়ের হয়ে জবাব দিল, "বুখার—আজ বিকেল থেকে হয়েছে—"

হঠাৎ যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল আজিজ, মেয়েটার একটা কিছু হলেই সে কাতর হয়ে পড়ে, তার চোখের সামনেকার সব কিছু অন্ধকার হয়ে আসে।

"বুখার ! তাহলে কি হবে জোহরা ?"

জোহরা স্বামীকে চেনে, সে কাছে এসে স্বামীর গায়ে হাত রাখল, হেসে বলল, "অত ঘাবড়াচ্ছ কেন, ছেলেমেয়ের কি বুখার হয় না ? হয়েছে, আবার সেরেও যাবে—"

"ডাক্তারের কাছে যাই ?"

"এখনি ? এই খেটে এলে আর—ব্যস্ত হচ্ছ কেন, কাল সকালে যদি বুখার না থামে তখন না হয় হাকিমকে বলো।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও থেমে পড়ল আজিজ, তাকাল মেয়ের দিকে। রাবেয়া কমলালেবুটা নিয়ে ব্যস্ত।

"বেটি—"

"উঁ ?"

"খুব তক্‌লীফ হচ্ছে ?"

"উঁহুঁ—"

"আচ্ছা বেটি, তোর পুত্‌লা কোথায় ? কি করছে সে এখন ?"

"সে এখন নিদ যাচ্ছে, ওরও তবিয়ৎ খারাপ। আমার তবিয়ৎ ঠিক না থাকলে তারও খারাপ হয়ে যায়—"

আজিজ আর জোহ্‌রা হাসল।

মেয়ের একপাশে বসল আজিজ, আর একপাশে বসল জোহ্‌রা। বসে বসে তারা অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলল। সংসারের খুঁটিনাটির কথা, অভাব অভিযোগের কথা।

হঠাৎ জোহ্‌রা এক সময়ে প্রশ্ন করল, "তাহলে তুমি কাল কাজে যোগ দেবে না ?"

"না জোহ্‌রা"—আজিজ মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল।

"লেকিন্—"

আজিজ জোহ্‌রার একটা হাত চেপে ধরল, "জোহ্‌রা—"

জোহ্‌রা থেমে গেল, তারপরে মৃদু হাসল, "বুঝেছি, যাক কিছু মনে করো না, লোভী, বড় লোভী আমি।"

জোহ্‌রার হাতে মৃদু একটা চাপ দিল আজিজ আর একটু হাসল।

"যাই, রুটি বানাইগে"—হঠাৎ জোহ্‌রার অসমাপ্ত রান্নার কথাটা মনে পড়ল।

"জোহ্‌রা—"

"কি ?"

"তুমি কি এখনো রাগ করে আছো ?"

"না।"

জোহ্‌রা চলে গেল, মেয়েকে কোলে নিয়ে চুপ করে বসে রইল আজিজ। জোহ্‌রার কথায় কিন্তু যুক্তি আছে। সাধারণের জীবন-দর্শন। কিন্তু সে কি করে জোহ্‌রাকে বোঝাবে যে আর সহ্য করা যায় না, পৃথিবীতে মুষ্টিমেয় স্বার্থবানেরা কোটি কোটি লোককে বঞ্চিত ও হতভাগ্য করে রাখছে ? সে কি করে জোহ্‌রাকে বোঝাবে যে তারা সেই সব রাজা আর নবাব বাহাদুরদের, মালিক আর জমিদারদের ধ্বংস করবে ?

পরদিন সকালে রাবেয়ার জ্বর কমল না, বরং বাড়ল। আজিজ দৌড়োল হাকিম নিজামুদ্দিনের কাছে। হাকিম তাকে আশ্বাস দিল যে ব্যাপার এমন কিছু নয়, ও সেরে যাবে। এক শিশি ওষুধ নিয়ে বাড়ী ফিরল আজিজ, মেয়েকে খাওয়াল, তার কাছে এসে বসল, নানা কথায় মেয়ের মুখে সে হাসি ফুটিয়ে তুলল। তারপরে একসময়ে রান্নাঘরের দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল।

"খাবে ?" জোহ্‌রা প্রশ্ন করল।

"হুঁ—"

"বোস।"

খেতে বসল আজিজ।

"কোথায় যাবে এখন ?" আড়নয়নে তাকাল জোহ্‌রা। সে তার স্বামীকে চেনে। সে জানে কি জবাব দেবে সে, কোথায় যাবে আজিজ। তবু মুহূর্ত্তের জন্য ভাবতে ভালো লাগল তার যে আজিজ হয়ত বলবে যে সে

কাজে যোগ দেবে, সে জোহরার উপদেশকেই মেনে চলবে। আর তার এই আনুগত্য প্রকাশিত হলে জোহরার হৃদয়টা অদ্ভুত একটা আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠবে, চোখে মুখে ঝলসে উঠবে বিজয়িনীর গর্ব্ব।

কিন্তু আজিজ যা বলল তা এই, "কোথায় যাব আবার, শিয়ালদার মোড়ে আজ আবার কিছু কমলালেবুও বিক্রী করব—বেশ লাভ হয় ওতে। গরমের দিন, লোকে পিয়াসের জ্বালায় কিনবেই এক আধটা। কাল আমি করিম মিঞার সঙ্গে কথা বলেছি—একশ' কমলালেবু সে আমায় বিক্রী করতে দেবে—জমা লাগবে না কিছুই।"

বলতে বলতে উৎসাহিত হ'য়ে উঠল আজিজ।

জোহরা তাকাল স্বামীর দিকে। সে কি নিরাশ হল? স্বামী তার কথায় কান দিচ্ছে না বলে সে কি আবার রেগে যাবে আজ? কিন্তু না, কোন জ্বালাই তো সে অনুভব করছে না! তার স্বামী সমস্ত বাধাকে জয় করে সৈনিকের মত অবিচলিত রয়েছে জেনে, তার কাছে সে হার মানল না দেখে জোহরা হঠাৎ খুশীই হল। স্বামীকে হারাবার আত্মগর্ব্বের থেকে স্বামী যে অপরাজেয় এই স্বামি-গর্ব্বই তার যেন বেশী হল। নিজের মনকে দেখে খুশী হল জোহরা, আশ্বস্ত হল। তবু তর্ক করার ঝোঁকটা সে এড়াতে পারে না যে।

সে বলল, "কিন্তু লীগের মন্ত্রীরা যে কথা বলেছেন তা কি মিথ্যে?"

আজিজ মুখ তুলল, উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "সব মিথ্যে জোহরা, সব ঝুটা। ওরা পাকিস্তান আর হিন্দুস্তানের কথা ভাবছে, ভাবছে নিজেদের পেট মোটা করার কথা, নিজেদের জবরদস্ত্ আর দৌলৎমন্দ করার কথা। পাকিস্তান কথাটা শোনায় ভালো, হলে ওদেরি লাভ, আমরা যে কে সেই থাকব। যখন মুসলমানেরা দেশের মালিক ছিল তখনো আমরা গরীব, এখনো তাই থাকব। তাই ওসবে ভুললে আমাদের দুঃখ কোনদিনই দূর হবে না জোহরা—"

"তাহলে তোমরা কি করবে ?"

"যা করছি—লড়াই। গরীবেরা এক জাত—তাতে হিন্দু মুসলমান নেই—"

জোহরা চুপ করে গেল।

খাওয়া শেষ করে উঠে গেল আজিজ।

পোঁটলা নিয়ে সে যখন বেরোবার উপক্রম করছিল এমনি সময়ে ডাকল রাবেয়া।

"আব্বা—"

"হাঁ বেটি—"

"শুনো—"

"হাঁ হাঁ বোলো বেটি"—রাবেয়ার পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল আজিজ, "ক্যা বাৎ হ্যায় বেটি ?"

"বোলুঁ ?"

"বোলো—বোলো"—মমতায়, স্নেহে কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে এল আজিজের। মেয়ের জ্বরোত্তপ্ত ললাটের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সে।

রাবেয়া তাকালো, ক্ষীণ হাসি হেসে বলল, "নয়া পুৎলা আজ লাও গে ?"

"আজ বেটি—আজ ?"

"আজ না হোয় তো কাল ?"

"হাঁ হাঁ—লাউঙ্গা—"

আজিজ ছোট একটা চুমু এঁকে দিল মেয়ের ললাটে, তারপর উঠে বলল, "আনব বেটি—এবার তুমি ঘুমোও, কেমন ?"

"আচ্ছা"—মাথা নাড়ল রাবেয়া। নতুন পুতুল আসবে, আর কি চাই। মুখে তার হাসির আভাস দেখা গেল, দেখা গেল একটা চাপা উত্তেজনা।

জোহরা তাকিয়ে তাকিয়ে বাপ-মেয়ের এই ছবিটি দেখল। তার চোখ

ছুটো একটা অপরিচিত অনুভূতিতে জ্বালা করতে লাগল। ছোটবেলার রূপকথা তার জীবনে সত্য হয়েছে—হয়ত অন্যভাবে, তবু তা সত্যই হয়েছে। তার পুরুষ, তার ঐ ননীর মত, চাঁদের মত মেয়েটা—এরা কি ঐশ্বর্য্য নয়! না, জোহ্‌রার দুঃখ করবার কিছু নেই।

আজিজ বেরিয়ে গেল।

চলতে চলতে সে তাকালো চারিদিকে। আবার সেই ছবি। অফিস-মুখী জনতা। ভর্ত্তি বাস্। ত্রস্ত পদক্ষেপ। আর ওদিকে লোহার লাইনে চাকচিক্য নেই, তার খাঁজে খাঁজে ধূলো। বিদ্যুতের তারে আগুন জ্বলছে না, শব্দ হচ্ছে না ঘটাং ঘট্ ঘট্ ঘট্, বাজছে না টং টং টং। ট্রাম চলছে না। অন্যায়ের প্রতিবাদে তা থেমে গেছে। অন্যায় দূর হলেই আবার তা চলবে। লীগ? মন্ত্রিসভা? হাসল আজিজ। সে খুব চিনেছে তাদের। মানুষকে ঘৃণা করতে শেখাচ্ছে তারা, নিজেদের স্বার্থ বাঁচাবার জন্য সাধারণ মুসলমানের হাতে তারা ধারালো ছোরা গুঁজে দিয়েছে। শুধু আজিজের মত শ্রমিকেরাই তাদের সেই ছোরাকে গ্রহণ করেনি, তারা জানে ওদের মৎলব কি। তাই ওসব ভাঁওতায় তারা ভুলবে না। আজ কুড়ি তারিখ। কোম্পানীর নোটিশ। কিন্তু কার সাধ্য ট্রাম চালাবে? শেয়ালদার ট্রাম ডিপোতেই আজ আজিজের ডিউটি। সে তার জিনিষপত্র বিক্রী করবে আর লক্ষ্য রাখবে। যদি কেউ চালায় তবে বাধা দেবে। ইউনিয়নের নির্দ্দেশ সে কাল রাতে পেয়েছে। যদি দরকার হয় তবে খুন ঢালবে আজিজ। জানোয়ারের মত দিনের পর দিন বেঁচে থাকার চেয়ে বাহাদুরের মত খুন ঢালা ঢের ভালো।

খুব খুশী মনে বাড়ী ফিরল আজিজ। কুড়ি তারিখের সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরল সে। তারা জিতেছে আজ। সংগ্রাম শেষ হয়নি, তবু আজ একটা যুদ্ধক্ষেত্রে তারা তাদের ঝাণ্ডা উড়িয়েছে। আজ একটা ট্রামও চলতে পারেনি। একটাও না। সাধারণ মুসলমানদের দাঙ্গার নামে উস্কে তাদের

ধর্ম্মঘটকে মাটি করতে চেয়েছিল সদাশয় দেশী সরকার,—কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়েছে। আজ তারা আর এক ধাপ এগিয়ে গেল তাদের আসন্ন বিজয়ের দিকে।

কিন্তু বাড়ী ফিরে মনের আলোটা দপ্ করে নিভে গেল।

মুখ শুক্‌নো করে রাবেয়ার পাশে বসে আছে জোহ্‌রা। স্বামীকে দেখে যেন স্পন্দন ফিরে পেল সে।

"কি হয়েছে বিবি—এ্যাঁ?" আজিজ শঙ্কিতচিত্তে প্রশ্ন করল।

ঠোঁট নড়ল জোহ্‌রার, বলল, "রাবেয়া—"

মেয়ের দিকে তাকাল আজিজ। চোখ বুজে নিঃঝুমের মত শুয়ে আছে রাবেয়া। বোধ হয় ঘুমোচ্ছে।

"কি হল রাবেয়ার—এখন জ্বর কি রকম?"

শুষ্ককণ্ঠে জোহ্‌রা বলল, "জ্বর আরো বেড়েছে, শির ধুইয়ে দিয়েছি তবু জ্বর ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে—"

"সকালের দিকে তো একটু কম ছিল—"

"হুঁ—"

"তাহলে—কি করি?"

"হাকিমের কাছে যাও—"

"তাই—তাই যাই—তুমি, তুমি ততক্ষণ একটু জলপটি দাও ওর শিরে, কেমন?"

"আচ্ছা—"

উত্তেজিতভাবে আবার ঘর থেকে বেরোল আজিজ। হাকিম নিজামুদ্দিনের কাছে গেল। হাকিম আবার তাকে অভয় দিল। এমন কি ব্যাপার আজিজ, ঘবড়ো মৎ বেটা, ঠিক হো যায়েগা। আরো দুটো শিশি দিলে হাকিম। দাম এক টাকা। ট্যাঁকের সব কিছু বের করে, দিয়ে থুয়ে রইল ছয় আনা। আজ লাভ হয়েছিল পাঁচ সিকা মত। কাল-

কের দু'আনা ছিল। রাবেয়ার পুতুল কেনা এখন অসম্ভব। আহা, বেচারী নিজে মুখ ফুটে চেয়েছিল। দিতে হবে কোনো মতে পরে, বুখারটা কমুক।

কিন্তু চার পাঁচদিন পরেও তা কমল না। সকালের দিকে জ্বর কম থাকে, আশা হয় যে একেবারেই ছেড়ে যাবে, কিন্তু যেই বেলা বাড়তে থাকে জ্বরও তেমনি ওপরে চড়তে থাকে।

হয়রান হয়ে পড়েছে আজিজ। মেয়ের এমন অসুখ কিন্তু পয়সা পায় কৈ? বাড়ীতে জোহরা একা ঘাবড়ে যায় কিন্তু থাকবার উপায় কৈ? পোঁটলা নিয়ে আর ঝুড়ি নিয়ে তাকে শেয়ালদার মোড়ে গিয়ে বসতে হল। মনিহারী জিনিষ আর কমলালেবু। এই বিক্রী করে তাকে সংসার চালাতে হবে, রাবেয়াকে সুস্থ করতে হবে, নিজেদের ধর্ম্মঘটকে চালু রাখতে হবে জিৎ না হওয়া পর্য্যন্ত।

সেই কমলালেবুওয়ালার মতই অভ্যস্তকণ্ঠে সেও হাঁকে—"দো দো আনা লে যানা—মিঠা কেঁওলা লে যা যানা—"

সেই লোকটা হাসে, বলে, "এ ইয়ার টেরাম কোম্পানী—"

"হাঁ ইয়ার?"

"ই তো মেরা বাৎ হ্যায়—"

'বেশখ—বড়া মিঠা বাৎ হ্যায়—"

লোকটা আর আপত্তি করে না, কেবল হাসে, তারপর বলে, "আচ্ছা, আও দোনো মিলকে চিল্লাবে—"

লুঙ্গিওয়ালা বিড়ি টানতে টানতে সায় দেয়, "হুঁ—তাই ভালো—কাজিয়া করো না—"

ওরা একসঙ্গে হাঁকে—"হাঁ দো দো আনা লে যানা, রস্‌গুল্লা ভি হার মানা—"

সন্ধ্যা হলে দ্রুতপদে বাড়ী ফেরে আজিজ। দুরুদুরু বুকে। হয়ত আজ রাবেয়ার জ্বর থেমেছে। হয়ত।

কিন্তু 'হয়ত'টা হয় না। রাবেয়ার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকেই যেতে থাকে। হাকিম নিজামুদ্দিনকে পয়সা দিয়ে যে ওষুধ কিনেছে আজিজ, তার ফল একটুও ফলে না দেখে সে হতাশ হয়ে পড়ল। অবশেষে বস্তির বুড়ো আহসান আলির কাছে পরদিন গেল সে।

"কি করি চাচা?" মেয়ের কথা বলে পরামর্শ চাইল আজিজ।

বুড়ো আহসান অনেকক্ষণ ভাবল, পরে বলল, "তুমি পটলডাঙ্গার মোড়ের ডগ্‌দার রায়কে দেখাও বেটা—লোকটার জ্ঞান আছে।"

"হাঁ?"

"হাঁ!"

"আচ্ছা।"

ইউনিয়ন ফাণ্ড্ থেকে গোটা তিনেক টাকা পেয়েছিল আজিজ। তার ওপর ভরসা ক'রে মেয়েকে কাঁথায় জড়িয়ে, কোলে নিয়ে সে ডাঃ রায়ের ওখানে গেল।

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে দেখল রাবেয়াকে, তারপরে বলল, "জ্বরটা খারাপ হে মিঞাসায়েব—প্যারাটাইফয়েড—"

"জী?"

"ঘাব্‌ড়ো না—ভালো ভাবে চিকিৎসা করলেই সেরে যাবে।"

"সারিয়ে দিন ডাগ্‌দারবাবু—দোহাই"—ছেলেমানুষের মত হাত জোড় করল আজিজ।

ডাক্তার হাসল, "তুমি কি পাগল নাকি হে, অত ভয়ের কিছু নেই—ভালো করে চিকিৎসা হলেই বিপদ কেটে যাবে—"

পকেট উজাড় করে ওষুধ কিনে বাড়ী ফিরল আজিজ।

রাস্তায় কানের গোড়ায় রাবেয়ার ক্ষীণ কণ্ঠ ধ্বনিত হল, "আব্বাজান—"

"বেটি—".

"মেরি নয়া পুৎলা ?"

নতুন পুতুল। লজ্জা পেল আজিজ। কিন্তু কি করবে সে? হাকিম ডাক্তার আর ওষুধ পথ্যেই তো সব বেরিয়ে যাচ্ছে, পুতুল কেনে কি করে?

তবু মেয়েকে আশা দিতে হবে—সত্য কথায় মেয়েটা খুশী হবে না। ওর এতটুকু আশা, এত ছোট একটা দাবী যদি না মেটে তাহলে দুঃখ পাওয়াটা খুব স্বাভাবিক।

"দেব—দেব বেটি, নিশ্চয় দেব।"

হ্যারিসন রোড ধরে এগোচ্ছিল আজিজ। এমনি সময় হঠাৎ সে লক্ষ্য করল যে রাস্তায় যেন লোক চলাচল হঠাৎ অতিমাত্রায় দ্রুত হয়ে উঠেছে। তখন বেলা প্রায় বারোটা। গাড়ী ঘোড়া দেখা যাচ্ছে না, বাস চলছে না, ট্যাক্সিগুলো সবেগে ছুটে যাচ্ছে আর মানুষেরা অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে দ্রুত হাঁটছে।

"ব্যাপার কি ?"

পার্শ্ববর্ত্তী লোকটিকে সে জিজ্ঞেস করল, "ক্যা হুয়া ভাই ?"

লোকটি বোধ হয় হিন্দু, সে চলতে চলতে কটমট করে তাকাল আজিজের দিকে, তারপর দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "কি আবার—দাঙ্গা—"

"দাঙ্গা !" কুড়ি তারিখে যা করতে পারেনি কর্ত্তারা, সেই দাঙ্গা লেগে গেল! হঠাৎ আজিজের মনে পড়ে গেল যে আঠাশে তারিখের সাধারণ ধর্ম্মঘটকে পণ্ড করল এই দাঙ্গা।

বিবর্ণ হয়ে সে বলল, "আবার দাঙ্গা !"

লোকটি শ্লেষভরে বলল, "হ্যাঁ, উপায় কি, তোমরাই তো ব্যাপারটাকে জিইয়ে রেখেছ মিঞা—"

আজিজ মাথা নাড়ল, নিঃশব্দে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল বুকের ওপরে যেখানে লাল কাগজে লেখা আছে 'ধর্ম্মঘটী ট্রাম শ্রমিক'। ম্লানভাবে হাসল সে,

যেন বলতে চাইল যে আমরা অন্য লোক ভাইসব, আমরা হিন্দুস্তানেরও নই, পাকিস্তানেরও নই, আমরা ভুখা মজ্‌দুর, আমরা বিত্তহীন শ্রমিক, আমরা গরীব উলুখড়। যারা ছোরা চালায় আর ছোরা খায় তারাও তাই, শুধু ওরা কেউ জেনেও জানে না যে এ রক্তপাতে ঘাতক আর নিহতের কোনো লাভ নেই, লাভ শুধু কয়েকজন তক্তওয়ালাদের যারা ওপরে বসে দূরবীণ দিয়ে যুদ্ধের মানচিত্র দেখে আর দুষ্টগ্রহের মত মূর্খ জনগণকে সর্ব্বনাশের দিকে তাড়না করে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালাল আজিজ। সঙ্গে রাবেয়া। কোন উন্মুক্ত রক্তলোভাতুরের মুখোমুখী দাঁড়ানো তার চলবে না।

জোহরা সামনে এসে দাঁড়াল, "না আজ তোমার যাওয়া চলবে না।"

"মানে—কেন?" বুঝেও না বোঝার ভান করল আজিজ।

জোহরার মুখে চোখে শঙ্কার ছাপ, বিরক্ত হয়ে তিক্তকণ্ঠে সে বলল, "কেন অমন করছ বলতো?"

"তুমিইবা কেন অমন করছ?"

"দাঙ্গা লেগেছে তার মধ্যেই যাবে?"

"না গেলে চলবে কি করে?" রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে আজিজ বলল, "মেয়েটার অসুখের কথা মনে নেই? আর এদিকে পকেটও যে শূন্য তাওতো জান।"

"তা হোক—তবু—"

"তুমি পাগল জোহরা—"

"আর তুমি উন্মাদ—"

"মানলাম, তবু আমাকে যেতেই হবে। আমি অনাহারে থাকতে রাজী আছি কিন্তু আমার ঐ চিরাগকে আমি ভুখ আর বিমারীতে মরতে দিতে পারি না বিবি। না, আমায় তুমি আটকো না।

আল্লা আমার মদৎগার আর—আর দশ বছরের পুরোনো মজছুর আমি, আমায় কেউ মারবে না। কারণ সবাই জানে যে আমরা একতরফা কারো সুখ চাই না—আমরা চাই সবার সুখ, সবার শান্তি—”

জোহরা মুগ্ধ হয়ে গেল। কড়া পর্দা না থাকলেও সে পর্দা মানে। বাইরের পৃথিবীটা ছোট হয়ে তার এই ছোট্ট ঘরটায় আশ্রয় নিয়েছে। বড় বড় নেতাদের সে নাম শুনেছে কিন্তু কারো বক্তৃতা শোনেনি। আজ একসঙ্গে আজিজের এতগুলো কথা যেন তাকে অভিভূত করে দিল। কিছুই আর বলতে পারল না সে, শুধু নির্ব্বাক হয়ে দেখল যে মেয়ের দিকে একটা উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পৌটলা-গুলো নিয়ে আজিজ বেরিয়ে গেল।

আজিজ বেরিয়ে গেল।

বস্তীর লোকেরা উত্তেজিত আলোচনা করছে, দল বেঁধে জটলা পাকাচ্ছে। দু'একজনের হাতে লাঠি সোটাও দেখা গেল।

বুড়ো আহসান আলি পেছন থেকে ডেকে বলল, “এই দাঙ্গায় কোথায় যাচ্ছিস বেটা?”

আজিজ মৃদু হেসে বলল, “আমি তো দাঙ্গাবাজ' নই চাচা, যে বসে থাকলেও খেতে পাব। তাছাড়া আমার বেটির অসুখ, আজ কিছু রোজগার করতেই হবে।”

এগিয়ে গেল আজিজ। পেছনে কয়েকজন একটা কঠিন মন্তব্য করল কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করল না।

হ্যারিসন রোডে পড়ল সে। রাস্তা প্রায় জনহীন বলা চলে। মাঝে মাঝে দু'একটা ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে ঝড়ের মত। গলির মুখে মুখে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী জনতা। শিয়ালদার মোড়ে কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিশ এসে

ঘাঁটি করেছে। দুই ফুটপাথ দিয়ে অল্প অল্প লোকজন চলাচল করছে। ডান ফুটপাথে হিন্দুস্তান, বাঁ ফুটপাথে পাকিস্তান। খাঁ খাঁ করছে রাস্তাঘাট, থম্‌থম্ করছে সব। খর রৌদ্রতাপে আকাশ মরুভূমির মত, রাস্তা গরম তাওয়ার মত, বাতাস লূ'এর মত। সেই বাতাসে টের পাওয়া যায় মানুষের বন্য হিংস্রতাকে, রক্তমাখা ছোরাকে দেখা যায় শূন্যতার দর্পণে। আর অদৃশ্য তুষার-স্রোতের মত নিরন্তর ভেসে আস্‌ছে কুৎসিত ভয়ের স্রোত, তার স্পর্শে চেতনায় সাইরেণের মত আর্ত্তনাদ উঠছে, পা অসাড় হয়ে পড়ছে।

জোর করে তবু এগোল সে শিয়ালদার মোড়ে, বাঁদিক ঘেঁষে সে বসল। উত্তেজিত কোলাহল ভেসে এল রাজাবাজার আর মাণিকতলার দিক থেকে। সশস্ত্র পুলিশ-বাহী লরি চলে গেল কয়েকটা। ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে তীরের মত একটা ফায়ার-ব্রিগেড ডানদিকে চলে গেল। ডান-দিকের একটা গলিতে তিনচারটে ছেলেমেয়ে তখনো খেলা করছে। আজকালকার ছেলেমেয়েগুলোর কোনো ভয়ডর নেই! রাবেয়ার অসুখ। একটা নতুন পুতুল চেয়েছিল মেয়েটা। কিন্তু কোত্থেকে দেবে সে? কোত্থেকে ?

নাঃ, রাস্তা ক্রমশঃ আরো জনহীন হয়ে পড়ছে। কোলাহল। একটা মোটর ভ্যানে ঘোষণা করে গেল যে সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সকাল আটটা পর্য্যন্ত কারফিউ জারী হোলো।

উঠল আজিজ। বাড়ী না ফিরে আর উপায় নেই। মোট বিক্রী হয়েছে দু'টাকা। লাভ আনা ছ'য়েক। মাথা ঘুরে যায় তার। যদি দাঙ্গা এমনি ভাবেই চলে তাহলেই হয়েছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। স্বার্থপর অন্ধদের কল্পনা। সাম্য-বিরোধী ধর্ম্মান্ধদের লড়াই। নিরীহের প্রাণহরণ করে তাদের সিংহাসনের বনিয়াদ তৈরী করছে। কিন্তু কতকাল ? কতকাল ?

বাড়ীর দিকে ফেরে আজিজ। চলতে চলতে এদিক ওদিক, সামনে পেছনে তাকায়। সন্দেহজনক কেউ নেই তো! চলতে চলতে বুকের ওপরকার সেইখানে হাত রাখে যেখানে সেপটিপিন দিয়ে আঁটা লাল কাগজের ওপরে লেখা আছে, 'ধর্ম্মঘটী ট্রাম শ্রমিক'। যেন একটা অক্ষয়-কবচ ওটা, যেন ভূত প্রেত দৈত্য দানা আর তাদের মত অস্বাভাবিক মানুষেরা ওটাকে দেখেই পালিয়ে যাবে।

দু'দিন কাটল, জ্বর কমেনি রাবেয়ার। দু'দিন কেটেছে অথচ দাঙ্গা থামেনি। মনে হচ্ছে আরো বাড়বে, বাড়তে বাড়তে ষোলোই আগষ্টের পর্য্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে। দু'দিন কেটেছে আর এই দু'দিন আজিজ কিছুই উপার্জ্জন করতে পারেনি। কেবল ঘরের মধ্যে নিষ্ফল হতাশায় পায়চারী করেছে, মেয়ের পাশে গিয়ে বসেছে, বস্তীর লোকদের উত্তেজিত ভাষায় গালিগালাজ দিয়ে সতর্ক করেছে যেন তারা ভুল না করে, জ্ঞান না হারায়। এই বস্তীর লোকেরা অপেক্ষাকৃত শান্ত। তার কথায়, আহসান আলির সদুপদেশে ফল ফলেছে, তারা কোনো গোলমালে যোগ দেয়নি।

কিন্তু মেয়েকে নিয়ে কি করবে আজিজ? ডাক্তার? ডাক্তারের কাছে যাবে কি করে?

বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল আজিজ। রোগশয্যায় মিশিয়ে আছে রাবেয়া, তার পাঁচ বছরের চিরাগ, তার বেদনাকণ্টকিত জীবনের রক্ত-গোলাপ। পুতুল—একটা নতুন পুতুল চেয়েছিল মেয়েটা অথচ—না, ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে কোনমতে।

একটা ধুতি পরে সে বেরিয়ে পড়ল।

দশ মিনিট বাদে, অতি সন্তর্পণে সে ডাঃ রায়ের বাইরের ঘরে ঢুকল।

ডাক্তার রায় চমকে উঠল, বলল, "তুমি!"

"জী—"

"কি চাই ?"

"বেটির অসুখ আরো বেড়েছে ডাগ্‌দারবাবু—"

"বেড়েছে ?"

"জী—ওকে বাঁচিয়ে তুলুন ডাগ্‌দারবাবু—দোহাই আপনার—"

"হুঁ—দাঁড়াও—"

সব শুনে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখল ডাক্তার রায়, তারপর আজিজের দিকে তাকিয়ে বলল, "এবার তাড়াতাড়ি চলে যাও—এ পাড়ায় আসতে তোমার ভয় হোল না ?"

"লেড়কির জন্যে—ইয়ে—তাছাড়া আমি তো মজ্‌দুর ডাগ্‌দারবাবু"—ম্লানভাবে হেসে সে নিজের বুকের ওপর হাত রাখল।

ডাক্তার রায় হাসল, "ওসব কথা ভুলে যাও, এখন লোকেরা ওসব বাছবিচার করে না—"

ম্লানভাবে হাসল আজিজ, তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে ডাক্তার রায়কে সেলাম জানিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরের ভেতর থেকেই আজিজ শুনতে পাচ্ছিল ওদের আলোচনা। রাস্তায় ওরা জটলা পাকাচ্ছিল।

জোহরা বিবর্ণমুখে বলল, "এত লোক খুন জখম হয়েছে ! এ্যাঁ ! বস্তীতেও আগুন ধরানো হচ্ছে ?"

আজিজ শুষ্ককণ্ঠে বলল, "কুত্তাশালারা এইসব করছে—খুনের নেশা। সরাবের নেশার মত, নেশা না কাটলে ওরা বুঝতে পারবে না যে কি করছে ওরা। কিন্তু ওকথা থাক বিবি, এখন মেয়ের দিকে তাকাও—"

জোহরা নির্ব্বাক হয়ে গেল, স্বামীর বেদনার্ত্ত মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সে মেয়ের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। সত্যি, বড় রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা।

মেয়ের রুক্ষ চুলগুলোর ওপর হাত বুলোতে বুলোতে আজিজের দু'চোখে জল এল। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে রাবেয়ার সারা দেহ, চোখ বুজে ক্লান্ত ভঙ্গীতে পড়ে আছে সে, যেন একটা আহত পাখীর ছানা। তার দু'চোখের কোলে গভীর কালো ছায়া, গালটা একটু ভেঙ্গে গেছে, হাতপা-গুলো শীর্ণ। তার রুক্ষ চুলগুলোর ওপর হাত বুলোতে বুলোতে আজিজ কেঁদে ফেলল।

মেয়ের কানের সামনে মুখটাকে নিয়ে সে ডাকল—"বেটি—রাবেয়া—মেরা মাই—"

রাবেয়া চোখ মেলল, বাপকে দেখে শীর্ণ হাসি হাসল, বাপের চোখের জল দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "রোঁতে কিউ আব্বাজান ?"

জোহরা মুখ ঘুরিয়ে নিল, সে আর এদৃশ্য সহ্য করতে পারছে না, তারো বুক ঠেলে কান্না আসছে।

আজিজ মাথা নেড়ে জবাব দিল, "আঁখমে কুছ্ গিরা হোগা—আচ্ছা বেটা, ক্যায়সি হো আভি ?"

মাথাটা বাঁদিকে কাৎ করে ললাটের ওপর একবার হাত বুলিয়ে রাবেয়া বলল, "আচ্ছি হুঁ—"

তারপরে হঠাৎ কি মনে পড়ায় সে আবার হেসে বলল, "আব্বাজান—"

"হাঁ বেটি ?"

"মেরা নয়া পুৎলা ?"

লজ্জায় ফ্যাকাশে হয়ে সবেগে মাথা নাড়ল আজিজ, "লাউঙ্গা—তুম্হারা নয়া পুৎলা আযায়গা বিটিয়া—"

"আচ্ছা"—আশ্বস্তা হয়ে রাবেয়া চোখ বুজল।

মেয়ের দিকে তাকাল আজিজ। একটা পুতুলের দাবীকে সে মেটাতে পারছে না! তার রাবেয়া, তার চিরাগ, তার দুঃখদীর্ণ জীবন-বৃক্ষের একটি মাত্র ফুল। যদি হঠাৎ রাবেয়া মরে যায়! ছিঃ—একি ভাবছে সে!

কিন্তু সত্যি, যদি রাবেয়া তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যায় তাহলে তো তার এই নতুন পুতুলের সাধটা অপূর্ণই থেকে যাবে। তাই কি হবে, তাই কি হতে পারে কখনো ?

সে উঠে দাঁড়াল।

"কোথায় যাচ্ছ ?" জোহরা প্রশ্ন করল।

"আসছি।"

গেল সে আহসান আলির কাছে। কয়েকটা টাকা ধার করবার জন্য।

শিয়ালদার মোড়ে কতকগুলো দোকান দরজাগুলোকে একটু ফাঁক করে রেখেছিল। দু'একজন নিতান্ত অভাবে পড়ে জিনিষপত্র কিনে নিয়ে যাচ্ছিল। তার মধ্যে একটা দোকানে গিয়ে সে একটা পুতুল চাইল। দোকানী তাকে দেখে সন্দেহের চোখে আড়নয়নে তাকাতে লাগল পুতুল বের করতে করতে। নানা রকমের পুতুল। নানা দামের—তারি মধ্যে একটা মেয়ে-পুতুল সে দেড় টাকা দিয়ে কিনল, বেশ পছন্দ হল তার পুতুলটা। রাবেয়াও নিশ্চয় খুশী হবে। এর আগের পুতুলটার দাম ছিল মাত্র ছ'আনা, এর দেড় টাকা। আসমান-জমিন তফাৎ। পুতুলটা পেলে রাবেয়ার রোগশীর্ণ মুখটা কেমন জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠবে তাই কল্পনা করে খুশী হয়ে উঠল আজিজের মন। না, রাবেয়া ঠিক সেরে উঠবে। খোদা, তোমার দয়ার সীমা নেই, তুমি রাবেয়াকে সুস্থ কোরে তোলো।

সাবধানেই আসছিল সে। হঠাৎ যেন মনে হল যে, ওপাশের ফুটপাথ থেকে কে একজন এগিয়ে আসছে তার দিকে। সবেগে। থমকে সরে দাঁড়াবার আগেই ব্যাপারটা ঘটে গেল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘটে গেল তা। আকস্মিক।

একটা ছোরা আমূল বসে গেছে আজিজের পিঠে, সেই অবস্থাতেই ছোরাটাকে ছেড়ে দিয়ে আততায়ীটি আবার দৌড়ে পালিয়ে গেল।

একটা ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করল আজিজ। দূরে যারা দেখতে পেয়েছিল তারা হৈহৈ করে উঠল। ত্রস্ত পদক্ষেপ।

ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে তাকাল আজিজ, পিঠে আর বুকে একটা প্রচণ্ড জ্বালা। বেদনা। পিঠে হাত দিতে গিয়ে হাতের পুতুলটা ছিটকে পড়ে গেল। বেদনায়, যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। পড়ে গিয়ে তাকাল পুতুলটার দিকে, এগিয়ে সেটাকে তুলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। পুতুলটা ছিটকে অনেকদূরে গিয়ে পড়েছে। হতাশ, ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে সে একবার পুতুলটার দিকে তাকিয়ে নিজের বুকের দিকে তাকাল, হাত রাখল সেই জায়গাটায় যেখানে সেফ্‌টিপিনে আঁটা লাল কাগজটার ওপর লেখা আছে 'ধর্ম্মঘটী ট্রাম শ্রমিক'।

যেন সে কিছু বলতে চাইল, কিন্তু পারল না। অসহ্য যন্ত্রণায় সব কিছু একেবারে অন্ধকার হবার আগে অস্পষ্ট গোঙানীর সঙ্গে সে একটু পাশ ফিরল আর বুকের ওপরকার সেই লাল কাগজটা তার নিজেরি রক্তে আরো লাল হয়ে উঠল।

———

ধানচোর

লক্ষ্মীপুরের বনমালী মহাজনের ওখান থেকে বাড়ী ফিরছিল নীলমণি রায়। নেমন্তন্ন খেয়ে।

বনমালী ভালই খাইয়েছে, একেবারে যাকে বলে পাকা ফলার। সুদী কারবার ক'রে অবস্থা পাল্‌টেছে বনমালী, তিল থেকে তাল করেছে, পিঁপড়ের পেট টিপে চিনি বের করার মত সাংঘাতিক লোক সে। সাংঘাতিক আর কিপ্টে। সেই বনমালী যে এত ঘটা ক'রে রীতিমত রাজকীয় ভোজের ব্যবস্থা করবে তা নীলমণি প্রথমে অনুমান করতে পারেনি। খুব অবাক হ'য়ে গিয়েছিল সে, মনে মনে প্রশ্ন করেছিল, ব্যাপার কি? ব্যাপারটা একটু বাদেই জানতে পেরেছিল সে। নিজের পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরেছিল বনমালী, দুটো রুই একসঙ্গে। দুটো রুইয়ের মাথা পড়েছিল দুই বন্ধুর পাতে। মাথাটা চিবোতে চিবোতে, ঘিলু চুষতে চুষতে হঠাৎ উদার হ'য়ে উঠেছিল বনমালী, রহস্যটা উদ্ঘাটন ক'রে দিয়েছিল এই ভোজনোৎসবের।

"ব্যাপার কি জানো মিতা? কি জন্যে আজ তোমায় না খাইয়ে পারলাম না?"

"না তো—কি?" সোৎসুক নেত্রে নীলমণি বনমালীর দিকে তাকিয়েছিল।

আকর্ণ-বিস্তৃত বিগলিত হাসিতে ঝল্‌মল্ হ'য়ে বনমালী বলেছিল, "চাঁদু সর্দারের পাঁচ বিঘা জমিটার ওপর ডিক্রীজারী করিয়ে নিয়েছি—"

তাই। চাঁদু সর্দার পাঁচ বিঘা জমি রেখে দেড়শ' টাকা ধার নিয়েছিল গত আকালে। মাখনের মত নরম, দামী জমি। সে ধার আর শোধ কর্তে পারেনি চাঁদু সর্দার। সুদ, তস্য সুদ, তস্য সুদ চক্রবৃদ্ধিহারে অতিকায়

অক্টোপাসের মত তার অসংখ্য বাহু দিয়ে চাঁহু সর্দারের ঋণশোধ করার ক্ষমতাকে একেবারে পিষে, থেৎলে ফেলল। ফল ডিক্রীজারী—পাকা ফসার—রুই মাছের মাথার রসালো ঘিলু। আঃ।

বন্ধুকে তারিফ না ক'রে পারে না নীলমণি। বুদ্ধি আছে বনমালীর, স্বনামধন্য পুরুষ বলা যায় তাকে। আর এমনটি না হ'লে কি বিষয়-আসয় করা যায়? নিজের কথাই স্মরণ করল সে। বাপ পীতাম্বর রায় মরার পর মাত্র পঁচিশ বিঘা জমি ছাড়া আর কিছুই ছিল না নীলমণির। কিন্তু তাই থেকে, বউয়ের গয়না বন্ধক রেখে টাকা ধার নিয়ে সুদী কারবার করে, আজ তার পৈতৃক পঁচিশ বিঘা দু'হাজার বিঘার জোতে এসে দাঁড়িয়েছে। গম্ভীরাতলার পেছন থেকে যে জমিটা দক্ষিণ দিকে ঢেউ খেলে দূর দিগন্তের দিকে চলে গেছে সেখানে দাঁড়িয়ে যদি কেউ জানতে পারে যে ওসমস্ত জমি নীলমণি রায়ের তবে সে অবাক হ'য়ে যাবে, নীলমণির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় মাথা নীচু না ক'রে পারবে না। কি ক'রে হল এই সম্পত্তি? বন্ধু বনমালীর মত নীলমণিরও বুদ্ধি ছিল বলে। পিঁপড়ের পেট টিপে চিনি বের করার কথাটা নিঃসম্বলদের খারাপ লাগলেও নীলমণি জানে যে চিনির স্বাদ পেতে হ'লে পরে ওসব বিষয়ে নিরঙ্কুশ হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নিজের কথা মনে মনে আলোচনা ক'রে আত্মতৃপ্তির একটা তৈলাক্ত হাসি তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল। পকেট থেকে একটা বিড়ি বের ক'রে ধরাল সে। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে হঠাৎ চলার বেগ একটু বাড়িয়ে দিল। নাঃ, অনেক রাত হ'য়ে গেছে।

আসবার সময় বনমালী বলেছিল তার গাড়িতে চড়ে ফিরবার জন্য। নীলমণি রাজী হয়নি। বলেছিল যে আকাশে চাঁদ আছে, পথও দেড় মাইলের বেশী নয়, জানোয়ারগুলোকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই, ধীরে-সুস্থে সে হেঁটেই বাড়ী ফিরতে পারবে। তাই হেঁটেই আসছিল সে।

ভোজনটা একটু গুরুতর রকমের হয়েছিল ব'লে প্রথমটা মন্থরগতিতে চলতে ভাল লাগছিল। কিন্তু হঠাৎ ঝিল্লীমুখর জ্যোৎস্নালোকিত রাতের বন্য সৌন্দর্যটাকে দেখে অস্বস্তিবোধ করল নীলমণি, বাড়ির কথা মনে পড়ল তার, সঙ্গে সঙ্গেই চলার বেগ বাড়াল সে।

রাত হয়েছে বটে। তিথিটা বোধ হয় দ্বাদশী কি ত্রয়োদশী, আকাশের বুককে আলোকিত ক'রে আছে একটা বড় চাঁদ। তার দুধের মত উজ্জ্বল সাদা আলো পাণ্ডুর ও স্নিগ্ধ হ'য়ে পৃথিবীর ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। চারদিকে তাকাল নীলমণি। গাছপালার একটা ঘন আবরণে চাপা পড়ে লক্ষ্মীপুর গ্রামটা অনেক পেছনে সরে গেছে এখন। চারদিকে দূর-বিস্তৃত মাঠ। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় মাখা সেই মাঠের ওপর দিকেদিগন্তে পাকা ধানের শীষ শেষ হেমন্তের ঝিরঝিরে, ঠাণ্ডা বাতাসে দুলছে। সোনার মত পাকা ধানের শীষ। হিমসিক্ত পাকা ধানের ভারে চারাগুলো আলের ওপর নুয়ে পড়েছে। তার ভেতর দিয়ে চলতে চলতে শব্‌শব্‌ একটা শব্দ ওঠে, গায়ে হিমকণার ঠাণ্ডা স্পর্শ লাগে, পায়ের জুতো ভিজে ওঠে। মোটা এণ্ডির চাদরটাকে আরো ঘন ক'রে গায়ের ওপর জড়াল নীলমণি, কান পেতে শুনল ঝিল্লীমুখর জ্যোৎস্নালোকিত রাতের গান, দেখল তার অপার্থিব ও বন্য সৌন্দর্যটাকে। দেখে বড় একা একা ঠেকল, কাছে বা দূরে কাউকে দেখাও গেল না আর দেখার উপায়ও নেই। ধানের আড়ালে আড়ালে কে কোথা দিয়ে যাচ্ছে তা দেখা সহজ নয়। মোটকথা, রাত হয়েছে। ক্ষেতের ওপর অখণ্ড ও বিরাট একটা নির্জনতা, আকাশের চাঁদের আলো ও নৈশ-শিশিরের সঙ্গে তা যেন মোমের মত গ'লে গ'লে পড়ছে আর ক্ষেতের ওপর প'ড়ে জমে যাচ্ছে। নাঃ, রাত হয়েছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা যাক।

বড় বড় পা ফেলে চলতে লাগল নীলমণি। কয়েক টানে বিড়িটাকে প্রায় শেষ ক'রে ফেলল সে, তার তলার দিকে আগুনটা পৌছুতেই যখন

চড়্‌চড়্‌ ক'রে একটা ক্ষীণ শব্দ উঠল আর ধোঁয়ার সঙ্গে ঠোঁটটায় একটা গরম ঢেউ এসে স্পর্শ করল তখন সে বিড়িটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর মিনিট দশেক জোরে জোরে চলতেই গ্রামের সীমানায় পা দিল সে।

তখন নিজের জমির একাংশ দিয়ে চলছে নীলমণি। হিমসিক্ত পাকা ধানের স্পর্শ লাগছে গায়ে। আনন্দে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠছে তার দেহমন। ফসল ভাল হয়েছে এবার, তার মানে মোটা মুনাফা, অনেক লাভ। জ্যোৎস্নালোকিত রাতের পরিবেশে, সোনালী ধানের শীষ দেখে মনে মনে সোনালী স্বপ্নের জাল বুনল নীলমণি। আরো জমি, স্ত্রী, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনীদের জন্য আরো গয়নার রঙীন স্বপ্ন।

হঠাৎ চম্‌কে উঠল সে। প্রায় একশ' গজ দূরে, জ্যোৎস্না আর হাল্কা কুয়াসা যেখানটায় পাতলা একটা পরদার মত থর্‌ থর্‌ ক'রে কাঁপছিল ঠিক সেখানটাতে খস্‌ খস্‌ একটা শব্দ উঠছে আর দুলে দুলে উঠছে ধানের ডগাগুলো। কি ব্যাপার? সাপ! উহুঁ, তা হবে কি ক'রে? এই সময়ে সাপ? তার সঙ্গে ধানের দোলার সম্পর্ক কি? তবে? বাতাস? তাই বা কি ক'রে হবে? ঝিরঝির ক'রে বইছে হাওয়া, মরা নদীর ক্ষীণ স্রোতের মত, তাতে ধানের ডগাগুলো অত জোরে দুলবে কেন? আর যদিই বা দোলে তাহ'লে সর্বত্রই একভাবে দুলছে না কেন? তবে কি ওখানটায়? গরু-মোষ?

স্থির হ'য়ে দাঁড়াল নীলমণি, কাঠের মত শক্ত হ'য়ে উঠল তার দেহটা। দেখতে হবে কার গরু-মোষ। কিন্তু খুব উৎকর্ণ হ'য়েও কোনো জন্তু-জানোয়ারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'তে পারল না সে। গরু-মোষ হ'লে আরো জোরে দুলত ধানের শীষ, নিশ্বাসের আর চিবোনোর ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ আওয়াজ শোনা যেত, দেহের আর পায়ের চাপে দলে-পিষে নিজেদের প্রকাশ ক'রে ফেলত জানোয়ারগুলো। তাছাড়া ধানের চারা তো আর গরু-মোষের চেয়ে উঁচু নয়। তবে? কি? ভাবতে লাগল নীলমণি।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠল, মাথা নীচু ক'রে বসে পড়ল আলের ওপর। আর পরক্ষণেই যা দেখল তাতে তার ললাটের ওপরকার সন্দেহের রেখাগুলো আরো কুটিল হ'য়ে উঠল, চোখ দুটো দুর্জয় হিংসায় বাঘের চোখের মত দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠল। সারিবদ্ধ, ঘন ধানের চারার মাঝে পলকের জন্য একটি কালো মূর্তিকে সে পরিষ্কার দেখতে পেল।

চোর! চুরি ক'রে ধান কাটছে!

তরল একটা আগুনের স্রোত পাক খেয়ে উঠল রক্তের মধ্যে, আর সেই রক্ত নিমেষে নীলমণির মাথায় চড়ে গেল। তার জমির ধান চুরি করছে! সাহস তো কম নয় হতভাগার! দৌড়ে গিয়ে চোরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হল তার। কিন্তু আত্মদমন করল সে, সাহসে কুলোল না। যদি হেঁসো নিয়ে তার ওপর লাফিয়ে পড়ে লোকটা! না, রক্তারক্তি হতে দিতে রাজী নয় নীলমণি আর এমনি এমনিও ছেড়ে দেবে না সে চোরকে। মুহূর্তে কি ভেবে নিয়ে ফিরে দাঁড়াল সে, নব্বই বছরের বুড়োর মত ঝুঁকে পড়ে, আলের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে চলতে লাগল সে, পৌঁছোল গিয়ে গাড়িচলার রাস্তায়, তারপরে প্রায় দৌড়েই বাড়ির দিকে চলল সে।

রাত তখন প্রায় এগারোটা হবে। বড় ছেলে হারাধন তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানার ওপর লম্বমান, আর একটু হলেই তার নাক হয়ত নাদব্রহ্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করত। কিন্তু তাতে বিঘ্ন জন্মাল নীলমণির উত্তেজিত ডাক।

"হারু—অ' হারু—হারু—"

হারাধনের তন্দ্রা ভেঙে গেল, একটা কিছু বলার আগেই বাপের গলা আবার শুনতে পেল সে।

"বৌমা—হারু কি শুয়ে পড়েছে, এ্যাঁ? ডাকো—শিগ্‌গীর ডাকো তাকে—শিগ্‌গীর—"

বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠল হারাধন, মিটমিটে হ্যারিকেনের পলতেটা বাড়িয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরোল সে।

"কি হল বাবা—কি হল ?"—তার কণ্ঠে উদ্বেগ ধ্বনিত হল।

উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল নীলমণি, ছেলেকে দেখেই উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "শিগ্‌গীর গবরদের একটা ডাক দে, নিয়ে চল্ ওদের দু'ভাইকে—লাঠি নিতে বলিস, বুঝলি ?"

"কি হয়েছে, ব্যাপার কি ?" মুহূর্তে তন্দ্রার রেশটা কর্পূরের মত উড়ে গেল হারাধনের। লাঠি! তাহলে একটা মারামারি হবে নাকি ? কিন্তু কেন ?

দ্রুতকণ্ঠে নীলমণি বলল, "চোর—ধান কাটছে"—

"কোথায় ? কোথায় ?" হারাধনের রক্ত উত্তাল সমুদ্রের মত গর্জন ক'রে উঠল, তার মজবুত দেহের লোহার মত পেশীগুলো থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠল।

"ঐ যে পুকুরের ধারের বিশ বিঘার দাগটা—যেটাতে ঝিঙাশাল ধান হয়েছে"—কথা বলতে বলতে হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল নীলমণি, "অত কথা কি এখখুনি না জানলে চলবে না তোর ? যা বলছি তা করলেই তো হয়—যা শিগ্‌গীর"—

আর কোন কথা না বলে হারাধন প্রায় ছুটেই চলে গেল সেখান থেকে।

ইতিমধ্যে নীলমণির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর বাড়ির সবাইকে আকৃষ্ট করেছে। রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছে তার বৌ কাত্যায়নী আর পুত্রবধূ বিমলা। চোদ্দ বছরের ছোট ছেলেটাও গোলমালের গন্ধ পেয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছে।

কাত্যায়নী প্রশ্ন করল, "কি করবে তবে ? এ্যাঁ ?" তার গলায়

এমন উদ্বেগ ফুটে উঠল যেন ডাকাত পড়েছে বাড়িতে, যেন সর্বস্ব লুঠ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে তারা।

"কি আবার করব—ধরব শালার ব্যাটাকে"—কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল নীলমণি্।

"ধরবে! মারামারি করবে নাকি?" কাত্যায়নী কাতর হ'য়ে উঠল।

নীলমণি পা বাড়িয়েছিল চাকরদের ডাকতে যাবার জন্য, থেমে বলল, "তা করব না তো চোরের সঙ্গে মিতালি পাতাবো নাকি? যত্ত সব"—

"তা চাকরবাকরেরাই যাক না—তুমি আবার কেন?" কাত্যায়নীর গলাটা কেঁপে উঠল।

"হয়েছে"—বিরক্ত হ'য়ে উঠল নীলমণি, ঝাঁজালো স্বরে বলল, "তোমার কথামত কাজ করলে ক্ষেত থেকে একটা পানের শীষও আর ঘরে ফিরবে না। চাকরবাকরেরাই সব উদ্ধার করবে আর কি—হুঃ"—বলেই দ্রুতপদে সে বাইরে চলে গেল।

কিন্তু কাত্যায়নী নাছোড়বান্দা, স্বামীর পেছন পেছন দৌড়োল সে।

নীলমণি বাইরে গেল। বাইরের ঘরের দাওয়ায় দু'জন চাকর শুয়ে ছিল। সারাদিনের খাটুনীর পর ওরা এখন চাদর মুড়ি দিয়ে গাঢ় ঘুমে অচেতন।

নীলমণি তাদের গায়ে ঠেলা দিল।

"এ্যাই—এ্যাই শীতল—ওরে গণ্শা—গণ্শা—"

ঝাঁকুনী খেয়ে চাকর দু'টো উঠে বসল, বিহ্বল, ঘুমন্ত চোখে তাকাল বোকার মত।

"ওঠ্, ওঠ্ শিগ্গীর"—

শীতল প্রশ্ন করল, "কি হইল বা? আঁ?"

"হল তোর মাথা—উঠতে বলছি ওঠ্ না কেনে বাপু"—ধমকে উঠল নীলমণি।

শীতল আর গণেশ উঠে দাঁড়াল। ঘুম-জড়ানো চোখের তারায় ওদের নিষ্ফল একটা আক্রোশ ফুটে উঠল। বাঃ, কি ব্যাপার তা না বলে মিছিমিছি ঘুম ভাঙাচ্ছে কেন রে বাবা!

"কি হৈল মাহাজন, কহছ না ক্যানে গো?" গণেশ একটু বিরক্তি প্রকাশ করল।

"শিগ্‌গীর লাঠি নে হারামজাদারা—ক্ষেতে ধান চুরি কর্চ্ছে চোরেরা"—

ঘুম উড়ে গেল শীতল আর গণেশের চোখ থেকে। চোর! ওদের শক্ত শক্ত কালো দেহের রক্ত নেচে উঠল। চোর, বটে! ছুটে দাওয়ার কোণ থেকে লাঠি নিয়ে নীচে নামল তারা।

লণ্ঠনের আলো দেখা গেল। হারাধন ফিরে এল, সঙ্গে তুই ভাই গোবর্ধন আর জনার্দন। দু'জনেই লাঠিবাজ মানুষ, মারামারির সুযোগ পেলে বর্তে যায়।

"কুনঠে গো কাকা?—চল্"—গোবর্ধন ডাক দিল নীলমণিকে, তরল হেসে বলল, "দেখি, কোন্ শালার মরণ হইছে আইজ"—

"বাতিটা নিয়েই যাবি—এ্যাঁ?" হ্যারিকেনটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল নীলমণি।

"পাগল না মাথা খারাপ—উটাকে লিয়ে কি হবে রে"—জনার্দন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—"নাঃ"—

"তবে চল্"—নীলমণি পা বাড়াল।

কাত্যায়নী এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। মানসনেত্রে একটা রক্তাক্ত ছবিকে দেখে তার সারা শরীর কণ্টকিত হ'য়ে উঠেছিল। স্বামীকে কিছু হাতে না নিয়ে যেতে দেখে সে আর স্থির থাকতে পারল না, অস্ফুট আর্তনাদের মত তার গলা থেকে একটা শব্দ বেরোল।

"শুনছ—ওগো"—সে ডাকল।

"সেরেছে"—প্রচণ্ড ক্রোধে ও বিরক্তিতে দাঁত কিড়মিড় ক'রে থেমে গেল নীলমণি, "সেরেছে, পেছু ডেকেছে। আচ্ছা তুমি কি—এ্যাঁ? পেছু ডাকলে তো, বাধা দিলে তো? একটুও কি বুদ্ধি নেই তোমার?"

নীলমণির তিরস্কারকে গায়ে মাখল না কাত্যায়নী, ব্যাকুলকণ্ঠে আবেদন জানাল, "একটা কিছু হাতে নিয়ে যাও তুমি—দোহাই তোমার"—

"আঃ—থামো না মা। কি বক্‌ছ, ঘাবড়াবার কি আছে?" হারাধন হঠাৎ অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠল।

"তাইতো"—মাথা নেড়ে সায় দিল গোবর্ধন, "আমরা নাই—আমাদের হাতে লাঠি নাই? যাও, ঘরোৎ যাও গো কাকী"—

"চল্ এবার গব্‌রা—আর সময় নষ্ট করিস্ না"—হঠাৎ হন হন ক'রে চলতে আরম্ভ করল নীলমণি, "সে শালারা এতক্ষণ পালিয়েছে কি না, কে জানে। চল্ চল্, শিগ্‌গীর চল্‌রে সবাই"—

হারাধন নিম্নকণ্ঠে বলল, "যাচ্ছি তো, কিন্তু একসঙ্গে গেলে তো হবে না, চারদিক থেকে ঘেরাও না করলে পালিয়ে যাবে ব্যাটারা।"

"ঠিক"—জনার্দন থম্‌কে দাঁড়াল, বলল, "এক কাজ করা যাক্"—

"কি?" নীলমণি উৎসুক হ'য়ে উঠল।

"পুকুরের দু'দিক দিয়ে দু'জন দু'জন ক'রে ঘেরাও করা হোক, আপনি আর হারাধন সামনের দিক থেকে আগাবেন। তারপরে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে—ব্যস্"—ডান হাত দিয়ে বাতাসের মধ্যে কারো অদৃশ্য গলাকে যেন চেপে ধরল জনার্দন।

"ঠিক"—জনার্দনের প্রস্তাবকে সমর্থন জানাল নীলমণি, বলল, "তাই, চল্ তবে। তোরা দু'ভাই একদিক দিয়ে যা, শীত্‌লা আর গণ্‌শা অন্যদিক দিয়ে যাক। কিন্তু তাড়াতাড়ি যা বাপু—চোর যেন না পালায়, হ্যাঁ"।

চাপাগলায় হেসে উঠল গোবর্ধন, "পালাবে শালার ব্যাটারা!—তুমি হাসালে কাকা—নাও, চল, চল এবার"—

হারাধন বলল, "যারা আগে চোরের সামনে পড়বা তারা চেঁচিয়ে জানিয়ে দিবা কিন্তু"—

"আচ্ছা—আচ্ছা"—

দু'দিকে দু'জন দু'জন ক'রে চলে গেল। নীলমণি ছেলেকে নিয়ে সামনের দিক থেকে এগোল। রাত আরো নিশুতি হ'য়ে পড়েছে, গ্রামের চোখ বুজে এসেছে। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, তবু এখন আর শীতবোধ হয় না নীলমণির, বরং বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয় তার ললাটে। চাপা একটা উত্তেজনায়, একটা অস্বাভাবিক ঘটনার প্রত্যাশায় হৃদ্‌পিণ্ডটা তার অতিমাত্রায় ধুক্ ধুক্ করতে থাকে। হঠাৎ দক্ষিণ দিকের বাঁশবন থেকে একদল শেয়ালের কোলাহল ভেসে উঠল। চম্‌কে উঠল নীলমণি।

ছেলের দিকে তাকিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে সে বলল, "চুপ্—চুপ্"—

হারাধন অবাক হ'য়ে গেল, "কেন—কি হল ? ওতো শেয়ালের ডাক"—

"তা তো জানি রে গাধা—তুই চুপ কর্ ।"

"চুপ ক'রে তো আছিই—বাঃ।"

"চল্—চল্, এগো"—

সন্তর্পণে, দ্রুতপদে এগোল তারা। জমির মধ্যে নামল, এগোল আল বেয়ে বেয়ে, ঝুঁকে পড়ে। মাথার ওপরে পরিষ্কার আকাশে বড় চাঁদটা। নীচে ক্ষেতের ওপরে, দূরে, হালকা কুয়াসার পরদা কাঁপছে। তার মাঝে মাঝে নিশ্চল প্রহরীর মত একটা দু'টো তাল গাছ দাঁড়িয়ে আছে। শোনা যাচ্ছে ঝিল্লীর যতিহীন একতান। হিমসিক্ত ধানের শীষের স্পর্শ লাগছে গায়ে।

হঠাৎ ছেলের ডান হাতের কব্জিটাকে চেপে ধরল নীলমণি, আঙুল তুলে দেখাল সামনের দিকে। প্রায় একশ' হাত দূরে ধানের চারাগুলো দুলে দুলে উঠছে। দুলে উঠছে আর নীচে নুয়ে পড়ছে। কয়েক পা এগিয়ে আরো ভালো ক'রে তাকাতেই পরিষ্কার দেখা গেল।

একটা লোক উবু হ'য়ে বসে ধান কেটে চলেছে। খানিকটা জায়গা সে কেটে প্রায় ফাঁকা ক'রে ফেলেছে। বড় বড় তিনটে আঁটি বাঁধা হ'য়ে গেছে ইতিমধ্যে। এক একটা আঁটিতে কম ক'রেও দশ সের ধান নিশ্চয় আছে। হয়ত কিছু বয়েও নিয়ে গেছে, কে জানে। হয়ত আশে-পাশে আরো সঙ্গীও আছে লোকটার।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল হারাধন। জোর ক'রে সে তার নিশ্বাসকে চেপে রাখল, উত্তেজনায় তা যেন সশব্দ না হ'য়ে ওঠে। আর নীলমণির বুকের ভেতরটায় যেন ঠক্ ঠক্ ক'রে কেউ হাতুড়ী পিটিয়ে যেতে লাগল। তিন-চার মিনিট অপেক্ষা করল হারাধন, যাতে ওদিকের দল দুটো আরো কাছে এগিয়ে আসে।

এক মিনিট—দু' মিনিট—তিন মিনিট—চার মিনিট। যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। নীলমণি অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠল। ছেলেকে সে মৃদু ঠেলা দিল, যেন নিঃশব্দে জানাল যে আর দেরী করা উচিত নয়।

হঠাৎ লোকটার পেছন দিক থেকে শর্-শর্ শব্দ উঠল। বোধ হয় গোবর্ধনদের আসার শব্দ। সেই শব্দে চোরটা চম্‌কে উঠল, তার ধানকাটা থেমে গেল, দু'হাতে মাটির ওপর ভর দিয়ে একটা চতুষ্পদ জন্তুর মতই সে যেন ঘ্রাণশক্তি দিয়ে এবং শব্দ শুনে বুঝবার চেষ্টা করল যে ঐ শব্দের পেছনে কোনো জন্তু না মানুষ লুক্কায়িত আছে।

সঙ্গে সঙ্গেই হারাধন এবার লাঠিটা উঁচিয়ে সামনের দিকে ছুটে গেল, আল ছেড়ে ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে, সব দলে পিষে। এগিয়ে যেতে যেতে প্রচণ্ড জোরে সে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল, "কে—কেরে শালা ?"

নীলমণির বুকটা ধ্বক্ ক'রে উঠল, উত্তেজনার আধিক্যে শরীরটা স্থাণুবৎ অচল হ'য়ে গেল, সেখান থেকেই হেঁকে বলল সে, "সাম্‌লে হারু"—

হারাধনের চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে অন্য দলেরও সাড়া ভেসে এল। ওরাও কাছে এসে গেছে।

"ধর্ ধর্"—

"ধর্ শালাকে ধর্—"

চোরটা হঠাৎ তিড়িং ক'রে একটা লাফ দিল। ঘুরে হারাধনের দিকে তাকাল সে, তাকে এগিয়ে আসতে দেখল নিজের দিকে। তার চোখে ঘনীভূত ত্রাস ঝিলিক দিয়ে উঠল, মুহূর্তকাল স্থির হ'য়ে সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থেকে সে যেন ভাবতে লাগল যে কোন্ দিক দিয়ে পালাবে, পরমুহূর্তেই সে নিজের ডান দিক দিয়ে কাস্তে হাতে তীরের মত ছুটে গেল।

"কোথায় পালাবু রে শালা—এ্যাঁ ?" গোবর্ধন লাঠি নিয়ে ছুটে এল সেদিক থেকে, হা-হা ক'রে হেসে বলল, "পালা—পালা দেখি—"

আবার একটা লাফ দিয়ে থম্‌কে দাঁড়াল চোরটা, আবার এদিক-ওদিক মাথাটা ছুলিয়ে, অসহায় ও ভয়ার্ত একটা চাহনি নিক্ষেপ ক'রে পেছন দিকে দৌড় মারল সে। কিন্তু সেদিক থেকে জনার্দনের গলা ভেসে এল। সেও ছুটে আসছে লাঠি উঁচিয়ে। ওদিকে বাঁ দিক থেকে শীতল আর গণেশও এসে পড়ল।

"ধর্—ধর্ ব্যাটাকে—" নীলমণির চীৎকার শোনা গেল।

আর কোন উপায় নেই। চোরটা জালবদ্ধ শিকারের মত অসহায়ভাবে সামনের দিকে তাকাল, এবার তার চোখের তারায় মরণার্ত পশুর মত একটা ক্রুর সঙ্কল্প ফুটে উঠল। কাস্তেটা উঁচিয়ে ধরল সে, চাঁদের আলোতে ঝকমক ক'রে উঠল সেটা, তারপর আবার সোজা দৌড় দিল সে। উদ্দেশ্য হারাধনের ওদিককার একটা কোণ ধরে সে পালাবে। উদ্দেশ্য যে বাধা পেলে সেই ধারালো কাস্তেটা দিয়ে কাউকে কাটতে হলেও সে দ্বিধা করবে না।

হারাধন স্থির হ'য়ে দুলতে লাগল। চোরের মনোভাব সে যেন আঁচ করতে পারল। চোরটা এগিয়ে আসছে, কাছে আসছে। ক্রমে আরো

কাছে এলো সে। হঠাৎ ডানকাৎ হ'য়ে বেরিয়ে যেতে চাইল সে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হারাধন ছুটে গেল তার দিকে, তাগ ক'রে লাঠি মারল তার কাস্তে-ধরা হাতের ওপর।

"বাপ্"—বলে আর্তনাদ ক'রে উঠল চোরটা, হাড়ের ওপর লাঠিটা পড়তেই ঠক্ ক'রে একটা শব্দ হল আর তিন-চার হাত দূরে ছিট্‌কে পড়ল কাস্তেটা।

উত্তেজিত দর্শকের মত নীলমণি ছুটে এল, "মার্ শালাকে—মার্"—

তবু পালাতে চাইল চোরটা, পালাবার জন্য সে কি আকুলতা তার, কিন্তু ততক্ষণে আর এক লাঠি পড়েছে তার পিঠের ওপর। কোঁৎ ক'রে একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ বের ক'রে চোরটা ধানক্ষেতের ওপর বসে পড়ল।

জনার্দন গোবর্ধন ছুটে এল, এল শীতল আর গণেশ, তারপর পাঁচ-জনে মিলে কষে মার দিতে আরম্ভ করল লোকটাকে। কিল, চড়, ঘুষি, কানমলা।

"আয় বাপ্—আয় বাপ্"—

জ্যোৎস্না রাতের অপরূপ পরিবেশটা কুশ্রী আর্তনাদে মলিন ও বিষণ্ণ হ'য়ে গেল।

"আউর মারিস নাই—আয় বাপ্‌রে—তুদের পায়োৎ ধরুছি রে বাপ"—

শেষ হেমন্তের হিমার্ত বাতাসে চোরটার বিকট আর্তনাদ আর আকুল কান্না দিগন্তবিসারী, তরঙ্গায়িত ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে মধ্যরাত্রির কোনো মরণাহত জন্তুর চীৎকারের মত ভেসে গেল।

"জান্ গেল্ রে বাপ্—জান্ গেল্"—

আর ওরা পাশব আনন্দে মেরেই চলল। রক্তের মধ্যে কোথায় যেন নির্যাতন করার পিপাসাটা বহুদিন ধরে প্রখর হ'য়ে সঞ্চিত ছিল, আজ এই চোরকে পেয়ে সেই পিপাসাই তারা নিবৃত্তি করতে চাইল।

"পায়ে ধরবি—বটে! বের করছি"—

"মার্ শালাকে"—

"উসব মায়াকান্না হাম্‌রা অনেক দেইখ্যাছি বাপ"—

"মার্ শালাকে—চোরের রীতই এই, না মারলে সায়েস্তা হয় না।"

মার খেতে খেতে শেষে এক সময়ে থেমে গেল লোকটা, লুটিয়ে পড়ল, আর আর্তনাদ করল না।

"কি হল রে? এ্যাঁ?" চোরটার নিশ্চল দেহের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে এল নীলমণির। তার মাথায় একত্রিত দেহের রক্ত যেন আবার নীচের দিকে ত্বরিৎগতিতে নামতে শুরু করল, পাংশুমুখে সে প্রশ্ন করল, "মরে গেল নাকি? তাহলে যে উলটো ফৌজদারীতে পড়বি রে বাপুরা"—

সবাই থামল, সবার চেতনা ফিরে এল, তাইত।

হারাধন ঝুঁকে নাড়ি টিপল চোরটার, মাথা নেড়ে বলল, "মরেনি, ভিম্‌রি খেয়েছে"—

সবার নিশ্বাস সহজ হ'য়ে এল। যাক্—

চ্যাংদোলা ক'রে চোরটাকে বয়ে নিয়ে এল ওরা। কাস্তেটাকেও আনতে ভুলল না। এনে শুইয়ে দিল বাইরের ঘরের দাওয়ার ওপর। ঘরের ভেতর থেকে কাত্যায়নী, বিমলা আর ছোট ছেলে মুকুন্দ ছুটে এল চোর দেখতে।

"চোর!" বিড় বিড় ক'রে উচ্চারণ করল মুকুন্দ, অবাক হ'য়ে।

সবাই তাকাল মূর্চ্ছিত চোরের দিকে। সাধারণ একটা বুনো বলে মনে হল। অচেনা, বোধ হয় পাশের গ্রামের। জনমজুরী ক'রে খায় হয়ত। বয়স প্রায় দু'কুড়ি, কালো কুচকুচে চেহারা। নিগ্রোদের মত কোঁকড়ানো, ছাঁটাই করা চুল, তার মধ্যে দু'একটাতে পাক ধরেছে। চ্যাপ্টা নাক,

পুরু ঠোঁট দু'টোর পাশে রক্ত লেগে রয়েছে। বোধ হয় ঘুষির চোটে বেরিয়ে এসেছে তা। রোগা শরীর, হাড়পাঁজরাগুলো বেশ প্রকট, হাতের আর পায়ের পেশীর মোটা মোটা শিরাগুলোকে দেখলে তালগোল পাকানো অনেকগুলো সাপের কথা মনে পড়ে। পরনে কিছুই নেই, কেবল কোমরে একটা এক বিঘৎ চওড়া ন্যাকড়ার ফালি আর একটা নেংটি। অতি-সাধারণ, গরীব মানুষ।

তবু কাত্যায়নী কিন্তু আঁৎকে উঠল, বলল, "বাবাগো! চোরের চেহারা দেখেছ তোমরা, ইস্! কি সাংঘাতিক!"

মুকুন্দ বলল, "আর কি কুচকুচে কালো মা—বাপ্!"

বিমলা মাথা নাড়ল শুধু।

নীলমণি স্ত্রীকে বলল, "সাংঘাতিক বলে সাংঘাতিক—খুনে লোকটা, নির্ঘাৎ খুনে"—

"বল কি গো!"

"তবে? হেঁসো তুলে আর একটু হলেই মেরেছিল হারুকে, নেহাৎ মা কালী বাঁচিয়েছেন।"

বিমলা মুখব্যাদান করল, নিশ্বাসটা টেনে কুম্ভক ক'রে ফেলল সে, শ্বশুরের কথা শুনে ভয়ে কেঁপে উঠল। যদি হেঁসোটা লাগত, তাহলে? ভাবতেও বুকের ভেতর ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে। হে মা কালী, রক্ষে করো মা।

কাত্যায়নী দু'হাত তুলে মা কালীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে, গদগদ কণ্ঠে, অর্ধনিমীলিত নেত্রে বলল, "মা বাঁচাবেন না তো কে বাঁচাবেন বল? মা, তোমায় আমি এবার পাঁঠা বলি দেব মা—কৃপা রেখো মা, মঙ্গল করিস্ মা—"

"আর শালা যে পালাবার চেষ্টা কইরাছিল, কি বুলব গো কাকী"—জনার্দন হেসে উঠল সেই ছবিটা কল্পনা ক'রে, "যেন একটা খরগোস"—

"খরগোস কিরে? রীতিমত বাঘের মত—নইলে হেঁসো ওঠায়!" নীলমণি জনার্দনকে সংশোধন করতে চাইল।

"অই হল—একই কথা"—

হঠাৎ গণেশ বলে উঠল, "লইড়ছে মাহাজন—লইড়ছে ছ্যাখেন"—

চোরটা একটু নড়ে উঠল, ঠোঁটটা একটু কেঁপে উঠল তার, অস্পষ্ট একটা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। তার পরেই চোখ খুলল সে।

নীলমণি লাফিয়ে উঠল, "চেপে ধর্, চেপে ধর্ শীত্লা—এ্যাই গণ্শা চেপে ধর্। হারু, শিগ্গীর যা, দড়ি নিয়ে এসে বাঁধ, বাঁধ শিগ্গীর, নইলে পালিয়ে যাবে"—

কাত্যায়নী, বিমলা সবাই পাঁচ-ছয় হাত পিছিয়ে গেল।

কাত্যায়নী বলল, "বিশ্বাস নেই বাবা—চোরকে বিশ্বাস করলে মাসতুতো ভাইকেও বিশ্বাস করা যায়—বাপ্! পেছিয়ে এসো বৌমা—এসো"—

হারাধন ঘরের ভেতর থেকে নারকেলের দড়ি নিয়ে এল। গণেশ আর শীতল চেপে ধরল চোরটাকে দু'দিক থেকে। তারপরে জনার্দন আর গোবর্ধন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধল তাকে। এমন বাঁধল যে নড়তেও পারবে না সে।

"ভালো ক'রে বেঁধেছিস তো বাবা—এ্যাঁ?" নীলমণি জনার্দনদের প্রশ্ন করল, এগিয়ে গিয়ে দেখল কেমন বেঁধেছে তারা, দেখে আশ্বস্ত হল।

ফিরে বলল সে, "হারু, তুই শেষ রাতেই চলে যাস্ লক্ষ্মীপুর—দারোগা সাহেবকে নিয়ে আসিস। গণ্শা, এই গাধা, গাড়ি তৈরি রাখিস"—

হারাধন মাথা নাড়ল।

চোরটার গোঙানি এবার আরো সুস্পষ্ট ও উচ্চ হ'য়ে উঠল, চোখের তারা দু'টো এদিক-ওদিক ঘোরাতে লাগল সে। দড়িতে বাঁধা ডান হাতটার কনুইয়ের নীচে লাঠি লেগেছিল, সেখানটা বেশ ফুলে উঠেছে, পিঠও বোধ হয় অমনি ফুলেছে, তারি যন্ত্রণাতেই বোধ হয় কাৎরাতে লাগল চোরটা, মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগল তার সারা শরীর। ছোট ছোট চোখের

তারাতে ভয়ার্ত খরগোসের নির্বোধ কাতর চাহনির মত একটা ব্যাকুল আবেদন।

"জল—ইট্টু জল"—চোরটার মুখে এবার কথা ফুটল।

নীলমণি দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "ইঃ, জল খাবে—জল! কেন রে ব্যাটা, চুরি ক'রে ধান কাটার সময় মনে ছিল না তোর"—

চোরটা একই ভাবে কাতর দৃষ্টি মেলে বলল, "জান্ গেল্ রে বাপ্—ইট্টু জল খামু"—

"বল্ ধান চুরি করেছিলি কেনে, বল্"—জনার্দন মাটিতে পদাঘাত করে গর্জে উঠল।

লোকটা কঁকিয়ে কঁকিয়ে বলল, "গরীব মনিষ্—তাই। দে বাপ্রে—ইট্টু জল দেরে বাপ্"—

নীলমণি মুখটা বাড়িয়ে বলল, "সঙ্গে আর কে ছিল সব বেরোবে কাল; দারোগাবাবুর ঠ্যালার চোটে।"

লোকটা কেঁদে বলল, "ইট্টু জল খামু—জল রে বাপ্"—

হঠাৎ কাত্যায়নী বিচলিত হ'য়ে উঠল, বুকের ভেতরটা কেমন যেন ক'রে উঠল তার, সে স্বামীকে বলল, "আহা, মরে যাবে নাকি লোকটা—একটু জল আনি।" চোরের বিষয়ে যে ভয়টা জন্মেছিল তার মনে তা যেন এই কাৎরানি দেখে মুহূর্তে উবে গেল।

"না না, তোমায় মোড়লী করতে হবে না"—নীলমণি ধম্কে উঠল, "মেয়েমানুষ নিয়েই যত মুস্কিল—যত সব ভ্যাজাল"—

"তুদের পায়ে পড়ি বাপ্—জল দে—জান্ যে গেল্"—

কাত্যায়নী হঠাৎ ছুটে ভেতরে চলে গেল, পরক্ষণেই নিয়ে এল এক ঘটি জল, লোকটার মুখের কাছে তুলে ধরে বলল, "খা হতভাগা—খা"—

"কি করছ তুমি, এ্যা!" নীলমণি স্তম্ভিত হ'য়ে গেল, ভয়ঙ্কর ক্রোধান্বিত হবার চেষ্টা করতে লাগল।

"কি আবার, জল দিচ্ছি"—কাত্যায়নী বলল, "কিন্তু খাবে কি ক'রে ও—নির্বংশার ব্যাটার হাত বাঁধা যে"—

"আচ্ছা তুমি কি ?" নীলমণি রাগতে চেষ্টা করেও ভয়ঙ্কর রাগ করতে পারছে না।

"কি আবার, মেয়েমানুষ।" নির্বিকার ভাবে জবাব দিয়ে কাত্যায়নী চোরটাকে বলল, "খা হারামজাদা, ঘটিতে মুখ দিয়েই খা"—

মুখটা বাড়িয়ে দিল চোরটা, একটা তৃষ্ণার্ত পশুর মত চোঁ চোঁ শব্দে সমস্ত জলটা টেনে নিয়ে আবার লুটিয়ে পড়ল দাওয়ায়, আবার গোঙাতে লাগল, মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগল প্রচণ্ড দেহ-যন্ত্রণায়।

নীলমণি রাগতস্বরে চোরটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, "কিরে ব্যাটা, জল তো খেলি—এবার বল্ দেখি কে কে ছিল সঙ্গে, এ্যাঁ ?"

কাত্যায়নী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "তোমার অত কথায় দরকার কি বাপু —তুমি এবার শোওগে না, ওরা ওকে পাহারা দিক।"

"বাঃ—জানব না সব কথা ?"

"কেন, তুমিই কি দারোগা সাহেব নাকি ?" মুচ্‌কি হাসল কাত্যায়নী।

"হ্যাঁ—আমিই তো মানে—না"—দাঁতে দাঁত ঘষে থেমে গেল নীলমণি, জ্বলন্ত একটা দৃষ্টি মেলে স্ত্রীকে ভস্মীভূত করার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে চোরটা হঠাৎ বেশী মাত্রায় কাৎরে উঠল, তাকাল সবার দিকে, কান্নার সুরে বলল, "গরীব মনিষ্—হামাকে ছাইড়্যা দেরে বাপ্—তুদের পায়োৎ পড়মু"—

হা হা ক'রে হেসে উঠল জনার্দন, নীলমণি একটা বিষাক্ত দৃষ্টি মেলে তাকাল তার দিকে আর গোবর্ধন গিয়ে একটা বিরাশি সিক্কা ওজনের চড় বসিয়ে দিল তার গালে।

কুৎসিৎ মুখভঙ্গী ক'রে সে বলল, "ছেড়ে দেব! ইস্—কি আমার বাপের ঠাকুর রে!"

সেই প্রচণ্ড চড় খেয়ে এক পাশে কাৎ হ'য়ে পড়ল চোরটা। কেমন ক'রে যেন চাইল সে, কেমন অসহায়, আকুলভাবে, ভয়ার্ত খরগোসের মত নির্বোধ চাহনি মেলে। তারপরে চোখটা বুজল সে। যেন চোখের সামনেকার প্রতিকূল পৃথিবীটাকে এড়াতে চাইল সে। চোখ বুজল সে, আর কথা বলল না, কেবল একটা ক্ষত-বিক্ষত নেড়ী কুত্তার মত থেকে থেকে গোঙাতে লাগল।

বেলা আটটা ন'টা নাগাদ দারোগা সাহেব এলেন। মোটাসোটা মানুষ, নানাদিক থেকে সমৃদ্ধি লাভ ক'রে মেদসমৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর চোখের তারা দু'টো ড্যাবডেবে, রক্তাভ, বুলডগের মত নিষ্ঠুর তার পাশব মুখাকৃতি। সঙ্গে দু'জন কনস্টেবল।

দারোগা সাহেব আসতেই নীলমণি সব খুলে বলল।

"বটে! হেঁসো তুলে মারতেও গিছল! চুরি—তার সঙ্গে আবার নরহত্যার চেষ্টা! বেশ, দু'দফা চার্জ হবে শালার ব্যাটার ওপর—চুরি আর খুনের দায়। কিছু ভাববেন না রায়মশাই, থানায় নিয়ে গিয়েই যা করবার করব, এখানে আমাদের প্রক্রিয়া শুরু করলে মেয়েরা অনর্থক ঘাব্‌ড়ে পড়বেন। আর কেউ সঙ্গে ছিল কিনা মারের চোটেই সব খবর বের ক'রে নেব। আচ্ছা, দেখি চোরকে একবার"—

চোরের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি, একটু নিরীক্ষণ ক'রেই গরিলার মত কড়া-পড়া শক্ত হাতটা দিয়ে ঠাস্ ক'রে তার গালে একটা চড় মেরে প্রশ্ন করলেন, "কি রে শুয়ারের বাচ্চা, ধান চুরি করেছিলি কেন? বল্ শালা—"

চোরটার কুচকুচে কালো রং যেন আরো কালো হ'য়ে গেল, কাঁপতে কাঁপতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় সে বলল, "গরীব—গরীব মনিষ্ হুজুর"—

দারোগাবাবু যেন ভেংচি কাটলেন, "গরীব মনিষ্! আহা হা—গলে গেলাম রে বাপ্। আচ্ছা, থানায় চল্ শালা কুত্তা"—

ভেতর থেকে জলখাবার আর চা এল। দারোগাবাবু স্মিতহাস্যে খানাপিনা করতে লাগলেন। ছোট ছোট চোখ মেলে চোরটা তার খাওয়া দেখতে দেখতে কেঁপে উঠল। কনস্টেবলরাও খেল। তাদেরও খাওয়া দেখল চোরটা, দেখতে দেখতে তার দৃষ্টিটা স্তিমিত হ'য়ে এল, ফাটা ফাটা শুকনো ঠোঁট দু'টো তার নড়ে উঠল।

জলযোগ-পর্ব শেষ হল।

"এবার যাই রায়মশাই, কেমন ?" দারোগা সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

"আজ্ঞে একটা কথা আছে। আসুন না, দয়া ক'রে এই ঘরে একটু আসুন না"—শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল নীলমণি।

দারোগা সাহেব নীলমণির দিকে তাকিয়ে হাসলেন, বললেন, "চলুন"—

কি যেন একটা কাগজের খস্‌খস্‌ আওয়াজ হল ঘরের ভিতর। কড়কড়ে নোট নাড়াচাড়া করলে যেমন আওয়াজ হয় তেমনি।

ঘর থেকে আবার বেরিয়ে এল দু'জনে।

বুলডগের মত নিষ্ঠুর মুখটাকে, অমায়িক হাসিতে অপার্থিব ক'রে তোলার চেষ্টা ক'রে দারোগা সাহেব বললেন, "বুঝেছি—আর বলতে হবে না রায়মশাই। শালার ব্যাটাকে আমি ফৌজদারীতে ফেলবই—কোন চিন্তা করবেন না। আচ্ছা, চলি এবার"—

"আজ্ঞে—নমস্কার।"

মাথাটা ঝাঁকিয়ে প্রতি-নমস্কার জানালেন দারোগা সাহেব, তারপর কনস্টেবলদের বললেন, "হাতকড়া লাগাও, জল্‌দি"—হাতঘড়িটা দেখে বিকৃত মুখে বিড় বিড় ক'রে বললেন তিনি, "এখুনি আবার নিয়ামৎপুরে যেতে হবে, কে যেন খুন হয়েছে ছাই"—

"এই শালা—হাত বাড়া"—

নিঃশব্দে হাত দু'টো বাড়িয়ে দিল চোরটা। ক্লিক্‌ ক'রে একটা শব্দ হল। দ্বিতীয় কনস্টেবলটি তার কোমরে দড়ি বাঁধল। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে

তা দেখল চোরটা। যে হাতকড়া পরাল সে ঘুরে বলল, "শালার গাও পুড়িয়ে যাইতেসে হুজৌর"—

চোরটা মাথা নাড়ল, বিড় বিড় ক'রে বলল, "হাড়গোড় সব ভাঙ্গি দিছে মাহাজনেরা, জ্বর হছে খুব—খু-ব। বাপ্‌রে"—নিজের গাঁয়ের ওপর সে বাঁ হাতটা দিয়ে বুলোল। সারারাত ধরে, এই সকাল ন'টা পর্যন্ত সে রজ্জুবদ্ধ অবস্থাতেই ছিল। আর সে কি বাঁধুনী! যেন বজ্র-আঁটুনী। নারকেলের দড়ি গায়ে কেটে বসে গিয়েছিল, মোটা মোটা দাগ এঁকে দিয়েছিল, সেই সব দাগের ওপরও সে হাত বুলোল। করুণ দৃষ্টি মেলে দারোগা সাহেবের মুখের দিকে সে একবার তাকাল—যেন তাঁকে নিঃশব্দে কোনো আবেদন জানাল, দয়া ভিক্ষা করল তার কাছে।

"চল্ চল্, এগিয়ে আয়"—দারোগা সাহেব ধমক দিয়ে বললেন।

"হুজুর"—গভীর একটা অন্তর্দ্বন্দ্বে ব্যাকুল হ'য়ে চোরটা হঠাৎ ডাকল।

"কি রে শালা?"

"হামাক্ কি জেহল্ দিবিন?" জলমগ্ন মানুষের কালো হতাশা যেন চোরটার মুখে।

"তবে কি করব রে সুমুন্দি—টাটে তুলে পূজো করব?"

"জেহলে ভাত দিবিন না বাপ্?" বিকৃত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল চোরটা।

"এ ব্যাটা কিরে—এ্যাঁ? আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাত পাবি, চল্"—একজন কনস্টেবল তাকে ধাক্কা দিয়ে বলল।

চোরটা যেন নিজের মনেই বলল, "তিন দিন ভাত খাই নাই রে বাপ্ —হয়, তি-ন দিন খাই নাই"—

অসহিষ্ণু দারোগা সাহেবের বুলডগের মত মুখটা ক্রোধে কুৎসিৎ হ'য়ে উঠল, রক্তাক্ত দৃষ্টিটা জ্বলে উঠল, এগিয়ে এসে একটা সবুট লাথি বসিয়ে দিলেন চোরটার পাছায়, গর্জন ক'রে বললেন, "চল্ শালা, হাঁট্—লেট করে দিচ্ছিস শালা শুয়ারের বাচ্চা—যত্ত সব"—

টাল খেয়ে সামলে নিল চোরটা, তারপর মাথা নীচু ক'রে, হাতকড়ি লাগানো হাত দু'টো সামনে ঝুলিয়ে সে চলতে আরম্ভ করল। আর তার কোমরের দড়িটা রইল একজন কনস্টেবলের হাতে।

হঠাৎ যেন কথা বলার নেশায় পেয়েছে চোরটাকে, কথার ভূত চেপেছে তার ঘাড়ে। বাতাসের মধ্যে কথা ভাসিয়ে দিয়ে কাকে যেন খবরটা জানাতে চাইল সে।

নিজের মনে সে বলতে বলতে চলল, "হামি তো জেহলে ভাত পামু —খামু ভাত। তিন দিন, হয় বাপ্‌রে, তি-ন দিন ভাত খাই নাই হামি—"

চোরটার চোখ দু'টোর কোণে দু'ফোঁটা জল দেখা দিল, পুরু পুরু ঠোঁট দু'টো কেঁপে উঠল, চাপা নাকটা ফুলে উঠল।

কিন্তু কথা তার তখনো ফুরোয়নি। বিড় বিড় ক'রে, ঈষদুষ্ণ বাতাসকে টেনে নিয়ে কাকে যেন প্রশ্ন করল চোরটা, "কিন্তুক্ হামার বহুটা, হামার ছেলাটা, হামার বিটিটা? উরাও তো তিন দিন ধইরা ভাত খাচ্ছে নাই, হায় রে বাপ্, তি-ন দিন। হামি তো জেহলে গেলম্ কিন্তুক্ উরা খাবে কি? অঁা? হামার ছেলাম্যায়া আর বহুটা?"

ভয়ঙ্কর

অশোক ভুল করেনি, চীনে রেঁস্তরাটার পাশেই তার দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল। আর সময়ও পার হয়ে গেছে। পাঁচটার সময়েই মীনাক্ষীর আসার কথা অথচ ঘড়ির কাঁটা বলছে পাঁচটা পনেরো মিনিট। রাস্তার দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে অশোক তাকিয়ে রইল। অফিস-টাইম, রাজপথে অফুরন্ত যাত্রী-বোঝাই ট্রাম, বাস ও ট্যাক্সি গাড়ীর প্রচণ্ড ভিড়। শীতের পড়ন্ত বেলা। দূরে গড়ের মাঠ আর তার পরে ঝুঁকে-পড়া আকাশটা ; কিন্তু এসব দেখেও যেন অশোক দেখে না—তার চোখের সামনে মীনাক্ষীর ছবিটা বারংবার ভেসে উঠতে থাকে। দীর্ঘাঙ্গী, ক্ষীণকটি, তন্বী নারীমূর্ত্তি। বৃষ্টিতে ধোয়া আমের মুকুলের মত, জ্যোছ্‌নার মত শুভ্র তার গায়ের রং, মুখটা লম্বাটে, পরিপুষ্ট ঠোঁট দুটোতে রসালো ফলের প্রলোভন আর তার দুটো টানা টানা চোখের তূণীরে আছে মর্ম্মভেদী কটাক্ষের শায়ক।

"চল"—

অশোক চম্‌কে উঠল। চোখের সামনেকার ভাসা ভাসা নারীমূর্ত্তিটা কখন যে রক্তমাংসের বাস্তব মূর্ত্তি হয়ে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে টের পায়নি।

"মীনাক্ষী !"

"হ্যাঁ—চল—"

"চল।"

"দেরী হয়ে গেছে—রাগ করেছ ?"

"করেছিলাম, কিন্তু তোমায় দেখে তা বাতাসে মিলিয়ে গেছে—"

লঘুকণ্ঠে একটু হাসল মীনাক্ষী। কিন্তু কেমন যেন প্রাণহীন তার হাসিটা। অশোক কিছু বলল না, শুধু নিঃশব্দে পা বাড়াল সে, জনতার স্রোতে মিশে গেল মীনাক্ষীকে নিয়ে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, রাঙা রোদকে ঢেকে অন্ধকার ঘনাচ্ছে। শীতের সন্ধ্যা। কাশ্মীরি শালের কোট রয়েছে মীনাক্ষীর গায়ে, হাতে ছোট্ট একটা ব্যাগ, পরনে আকাশের মত নীলরঙের একটা শাড়ী। শীতের আমেজে তার ঠোঁট আর গালের নীচেকার রক্ত যেন জমে ঘোর লাল হয়ে উঠেছে। অশোকের থম্‌কে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে, চলতে চলতে মীনাক্ষীকে যেন ভালো করে দেখা যায় না।

"কোথায় যাবে মীনা?" প্রশ্ন করল সে।

গম্ভীরমুখে মীনাক্ষী বলল, "তাই তো ভাবছি।"

"ফিরপোতে?"

"না।"

"ক্যাসানোভায়?"

"না—"

"সিনেমা?"

"না—"

"গাড়ীতে চড়ে বেড়াবে?"

"না—"

"তবে কি করবে?" অশোক অবাক হয়ে গেল। কি হয়েছে মীনাক্ষীর? ভেবে সে ঠিকই করতে পারল না।

মীনাক্ষী মৃদুকণ্ঠে বলল, "মাঠের কোনো নির্জ্জন অংশে চল—"

"কেন মীনা?"

"ভিড় ভালো লাগছে না—"

অশোক মাথা নাড়ল, "কিন্তু কেন? আজ তোমার কী হয়েছে মীনা?"

হাসবার চেষ্টা করল মীনাক্ষী, বলল, "কৈ, কিছু না তো, তুমি বড় খুঁৎখুতে।"

এগিয়ে গেল দুজনে, মাঠের দিকে। শীতের সন্ধ্যা ঘন হয়ে রাত হয়ে গেল, কুয়াসামণ্ডিত অন্ধকার তাদের চারদিকে আবর্ত্ত তুলতে লাগল আর ভৌতিক রাজ্যের বিবর্ণ আলোকস্তম্ভের মত দূরবর্ত্তী রাস্তায় গ্যাসলাইট-গুলোকে জ্বলতে দেখা গেল। চুপ করে বসে রইল দুজনে। পাশাপাশি। অনেকক্ষণ ধরে।

শেষে একসময়ে অসহ্য বোধ হল অশোকের। আজ যেন মীনাক্ষীর ধরণটা একেবারে উল্‌টো হয়ে গেছে। রোজকার হাস্যময়ী মুখরা মীনাক্ষী আজ এমন কেন? তাকে যেন চেনাই যায় না। মাঠের এই নির্জ্জন অংশটাতে, কুয়াসা আর আধো অন্ধকারের সুযোগে মীনাক্ষীর মধ্যে অন্যদিন যে বন্য আবেগের সৃষ্টি করত আজ তা কোথায়?

"মীনা—"

"উঁ?"

"কি হয়েছে তোমার?"

মীনাক্ষী চুপ করে রইল।

অশোক অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, মীনাক্ষীর একটা হাত টেনে নিয়ে ঝাঁকুনী দিয়ে সে আবার বলল, "তোমাকে বলতেই হবে। কেন তুমি আজ এমন গম্ভীর, এমন মন-মরা! কি হয়েছে তোমার?"

কি ভেবে যেন শিউরে উঠল মীনাক্ষীর শরীর, অশোকের দিকে আরো একটু সরে গিয়ে সে বলল, "কি হয়েছে তা আজ বলব তোমাকে—"

"বল—"

বিষণ্ণ ভঙ্গীতে ক্লান্তকণ্ঠে মীনাক্ষী বলল, "অনেক সহ্য করেছি—কিন্তু আর পারছি না—"

"বল মীনা—"

"একজন—একজন লোক আমার সর্ব্বনাশ করতে চায়—"

মীনাক্ষীকে সজোরে বুকে টেনে নিয়ে হিংস্রকণ্ঠে প্রশ্ন করল অশোক,

"তার মানে ? কে ? কে তোমার সর্ব্বনাশ করবে ? কেন ? সব কথা খুলে বল মীনা—বুঝলে ? স-ব—"

অশোকের বুকে মাথাটা রেখে মীনাক্ষী বলল, "বলছি, বলছি—আমাকে একটু দম নিতে দাও—"

চোখের ঘুম উড়ে গেল অশোকের। গড়ের মাঠের নির্জ্জন অংশ, সন্ধ্যার অন্ধকার আর শীতের কুয়াসা এখন অতীতের বস্তু হয়ে গেছে। নিজের ঘরে রাত বারোটারও পরে সে পায়চারি করছিল, উন্মত্ত দৈত্যের মত। জ্বালাময় উত্তপ্ত অনুভূতিতে যেন ঘরটা বোঝাই হয়ে আছে। বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, পাড়াটাও নিঃশব্দ। শুধু মাঝে মাঝে দূরবর্ত্তী চারতলা বাড়ীটার ভেতর থেকে পিয়ানোর আওয়াজ ভেসে আসছে। কে যেন রহস্যময় শীতার্ত্ত রাতের বুকে সুরের তরঙ্গ সৃষ্টি করছে।

ছটফট করছে অশোক। ভুলতে পারছে না সে। মীনাক্ষীকে সে ভালোবাসে। ছোটবেলা থেকে তাকে সে দেখে আসছে। সে তার বাবার বন্ধুর মেয়ে। মীনাক্ষীর বাবা বড় চাকরী করতেন কিন্তু বছর দুয়েক হল তিনি মারা গেছেন। দুই পরিবারে বহু দিনের ঘনিষ্ঠতা বলেই অবাধে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছে তারা। ফলে বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে মহীরুহের উৎপত্তি হয়েছে। ভালো লাগার অস্পষ্ট, মৃদু অনুভূতি শেষে ভালোবাসার দুর্ব্বার ও প্রখর অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

অশোক মীনাক্ষীকে ভালোবাসে। কথাটা আর কারো অজানা নেই। দুটি পরিবারের লোক এবং সমাজ সংসার তা জেনে ফেলেছে। সবাই তা যেন স্বীকার করে নিয়েছে।

সেই মীনাক্ষীর পেছনেই হঠাৎ একটা পশুর আবির্ভাব ঘটেছে। আজ মীনাক্ষী সেই কথাই বলল সন্ধ্যেবেলায়—গড়ের মাঠের নির্জ্জন অংশে, কুয়াসা ও আধো অন্ধকারে—ভীরুকণ্ঠে, আতঙ্কে। অনেক দিন ধরেই সেই লালসাতুর পশুটা তার লোলুপ নখদন্তকে প্রকাশ করেছে, মীনাক্ষী গায়ে

মাখেনি, নিঃশব্দে এতদিন তা সে সহ্য করেছে। কিন্তু সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে বলেই আজ সে অশোককে সব কথা খুলে বলেছে। সে ভয় পেয়েছে।

কিন্তু সব বলেও মীনাক্ষী একটা কথা বলেনি। সেই জানোয়ারটার নাম। কে সে? কি করে? কিছুই বলেনি মীনাক্ষী শুধু তাকে জানিয়ে দিয়েছে ব্যাপারটা, শুধু তাকে বলেছে যে সে বিপদে পড়েছে, শুধু বলেছে যে নামটা এখন বলবে না, যদি তেমন কিছু ভয় দেখা যায় তখনি সে সেই লোকটার পরিচয় জানাবে। কিন্তু এটুকু বলেছে যে ভারী অপমানজনক সেই পশুটার ব্যবহার, ভারী নির্লজ্জ, ভারী কুৎসিত তার প্রস্তাবটা।

ঘরের মধ্যে অস্থিরচিত্তে পায়চারি করতে লাগল অশোক। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলল। শীতের রাতটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় ভারী হয়ে উঠল। একটা প্রমত্ত দৈত্যের মত হিংসায় ফুলতে লাগল অশোক। আচ্ছা, অপেক্ষা করা যাক। আজ না তো কাল, কাল না তো পরশু। যেদিন সেই বদমায়েস লোকটার পরিচয় উদ্ঘাটিত হবে সেদিনই সে তার গলাটা টিপে ধরবে, সেদিনই সে তাকে বুঝিয়ে দেবে যে অশোকের মীনাক্ষী শুধু অশোকেরই, আর কারো নয়। মীনাক্ষীর গায়ে যদি সেই পশুটা ভুলেও একটা আঁচড় কাটে তবে সে আদিম অরণ্যের আইনটাকেই নিজের হাতে তুলে নেবে।

তার চোখের তারায় রক্তের গাঢ়তা পরিস্ফুট করে রাতটা শেষ হল। দিনটাও কেটে গেল। অশোক চুপ করে বসে বসে সময় কাটাল। মীনাক্ষীর আসার কথা ছিল তাদের বাড়ীতে। তাকে আসতে না দেখে সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। ব্যাপার কি হল? মীনা'র কি শরীর খারাপ? কিংবা—কিংবা সেই লোকটা কি আবার জ্বালাচ্ছে তাকে? বনেদী জমীদারের ছেলে অশোক। তার রক্তে আছে পিতৃপুরুষের দুরন্ত আবেগ। বেচাল আরবী ঘোড়ার উদ্দাম আবেগ।

একটা জামা টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অশোক।

মীনাক্ষীদের বাড়ী যেতে মাত্র দশ মিনিট লাগে। বড় বড় পা ফেলে পাঁচ মিনিটে সেখানে গিয়ে হাজির হল অশোক।

"মীনা—মীনা"

ডাকতে ডাকতে ভেতরে গেল অশোক ; বাড়ীতে বেশী লোক নেই।

মীনা'র ছোট বোন খুকু, ছোট ভাই জিতু আর মা।

"মীনা—"

"কে ?"—মীনা'র মা সাড়া দিলেন, এগিয়ে এলেন কাছে, "ওঃ—অশোক !"

"কাকীমা, মীনা কোথায় ?"

"বেরিয়েছে কোথাও—কেন, তোমাদের বাড়ী যায়নি সে ?"

"না তো"

"তাহলে জানিনা বাবা"

"ওঃ—আচ্ছা" একটু ভাবল অশোক, "আচ্ছা, একটু বসি আমি কাকীমা"

"বেশ তো বাবা, বোস, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি"

যাবার আগে হঠাৎ মীনা'র মা অশোকের দিকে তাকালেন, তার এলোমেলো চুল, লাল চোখ আর শুকনো মুখকে লক্ষ্য করলেন।

"অশোক—"

"কি বলছেন ?"

"তোমার কি হয়েছে বাবা ?"

"কিছু না তো—কিছু না—"

"তোমরা দুজনে কি ঝগড়া করেছ ?"

"না—না কাকীমা—"

মীনা'র মা চলে গেলেন।

সময় কেটে চলল। মিনিট, ঘণ্টা, কয়েক ঘণ্টা। দিনের আলো অন্তর্হিত হল, সন্ধ্যে হল, রাত এলো। তবু মীনাক্ষী ফিরল না। শেষে বাড়ী ফিরে গেল অশোক। রাগ করে। কি রকম মেয়ে মীনাক্ষী? কোথায় যাচ্ছে তা বাড়ীতে জানায়নি, অশোকের কাছেও যায়নি। তবে? কোথায় গেল সে?

কিন্তু বাড়ী ফিরে দমটা যেন আটকে আসে। সেই তার ঘর। ভারী বাতাসে ভর্ত্তি। এর চেয়ে মীনাক্ষীদের বাড়ীতে বসাই যেন ভালো ছিল। মীনাক্ষী বাড়ী না থাকলেও সেখানকার বাতাসে আছে তার মৃদু দেহসৌরভ, তার দেহের উত্তাপ। মিনিটকে মনে হল এক যুগ, এক ঘণ্টাকে মনে হল অনন্ত কালসমুদ্র। হাঁফিয়ে উঠল অশোক। আজ মীনাক্ষীকে দেখা হল না। কিন্তু কোথায় গেল সে? কোথায়? হঠাৎ কি ভেবে শিউরে উঠল অশোক, চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল তার। কোনো বিপদ হয়নি তো মীনা'র? সেই পশুটা তার পশ্চাদনুসরণ করেনি তো?

অসহ্য বোধ হল তার, সে পা টিপে নীচে নেমে গেল। কিন্তু হলঘরে গিয়েই থেমে গেল সে। বাইরে মোটর থামল এসে, দরজা খুলে তা থেকে বেরিয়ে এলেন তার বাবা। একটু আড়ালে দাঁড়াল অশোক। খুব রাশভারী লোক—বাবার সামনে পড়লেই বিপদ হবে—এখন বেরোনো চলবে না।

তার বাপ ভেতরে ঢুকলেন, হলঘর পেরিয়ে সিঁড়িতে পা দিলেন, ওপরে চলে গেলেন।

অশোক তখন অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এল।

বাইরে শীতের রাত। গাঢ় কুয়াসা, প্রায়-নির্জ্জন রাস্তা, প্রেতলোকের আলোকস্তম্ভের মত বিবর্ণ গ্যাসের আলো। তার ভেতর দিয়ে প্রায় ছুটে গেল অশোক। দশ মিনিটের পথ সে কয়েক মিনিটে অতিক্রম করে মীনাক্ষীদের বাড়ীর দরজায় করাঘাত করল।

চাকরটা এসে দরজা খুলে দিল।

মীনা'র মা বারান্দায় ছিলেন, অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "আবার এলে যে বাবা? এত রাতে!"

"মীনা এসেছে কাকীমা? বিশেষ একটা কথা আছে।"

"এসেছে—ঐ ঘরে—"

ঘরের মধ্যে গেল অশোক।

একটা চেয়ারে বসে ছিল মীনাক্ষী। আকাশের মত নীল সেই শাড়ীটা পরনে, গায়ে সেই কাশ্মীরি শালের কোট্‌টা। মানে এখুনি এসেছে সে।

"মীনা—" অশোক ডাকল।

কি যেন ভাবছিল মীনাক্ষী, হঠাৎ অশোকের ডাক শুনে সে ভয়ঙ্কর চম্‌কে উঠল, অজানা একটা ত্রাসে তার চোখ দুটো হরিণের চোখের মত বড বড় হয়ে উঠল। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল অশোক যে মীনাক্ষীর চোখে মুখে যেন একটা বিয়োগান্ত ছাপ, তার চুল এলোমেলো, চোখের নীচে কালো ছায়া, ললাটে চিন্তার রেখা, গালটা ভাঙ্গা, ভঙ্গীটা ঘরপোড়া মানুষের মত।

অশোক তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

"কি হয়েছে মীনা?"

মীনাক্ষী জবাব দিল না।

অশোক মীনাক্ষীর মুখটা তুলে ধরল, নিজের মুখটা এগিয়ে নিয়ে গেল তার দিকে। সজোরে তাকে ঠেলে দিল মীনাক্ষী, আর্তকণ্ঠে বলল, "না—"

"কি?"

"আমাকে ছুঁয়োনা তুমি—"

"কেন?" বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল অশোক, "কেন মীনা?"

মীনাক্ষীর দুচোখ তখন জ্বলছে, রক্ত আর আগুনের জ্বালায়, নাকটা ফুলে উঠেছে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

অশোক বসে পড়ল তার হাঁটুর কাছে, মৃদুকণ্ঠে সাতঙ্কে প্রশ্ন করল, "কি হয়েছে মীনা—কি হয়েছে?"

উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মীনাক্ষী, দুহাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ সে আকুলভাবে কেঁদে উঠল, বলল, "রাহু—আজ আমাকে রাহুতে গ্রাস করছে"

অশোক উঠে দাঁড়াল, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ফিরে এল, কঠিনকণ্ঠে বলল, "আমাকে আজ সব কথা খুলে বল মীনা—স-ব"

"বলছি"

সব কথা বলল মীনাক্ষী। সেই লালসাতুর লোকটার কথা। অনেক দিন ধরে যে তার লোলুপ নখদন্তে শান দিচ্ছিল। আজ হঠাৎ সে রাস্তায় তাকে গাড়ীতে তুলে নেয় মিথ্যে অজুহাতে। তারপর নানা জায়গায় ঘুরিয়ে সে তাকে একটা হোটেলে নিয়ে যায়, জলখাবারের সঙ্গে পানীয়ের নামে কি একটা তেতো জিনিষ খাওয়ায়, বোধ হয় মদ। ক্রমে তার চেতনা ঝাপসা হয়ে আসে, তখন সেই লোকটা তাকে হোটেলের একটা কামরায় নিয়ে যায়। তারপর—তারপর সেই স্তিমিত, অবসন্ন, মত্ত চেতনার সুযোগে, সেই লোকটা তার চরম সর্ব্বনাশ করে। কাহিনী শেষ হল। জড়পিণ্ডের মত চুপ করে বসে রইল অশোক। বোধ হয় অনেকক্ষণ। ঘরের মধ্যে তারা দুজনে নিজেদের দ্রুত ও উত্তেজিত নিঃশ্বাসের শব্দ অনেকক্ষণ ধরে শুনল।

হঠাৎ অশোক চাপা গলায় বলল, "আমি তাকে শাস্তি দেব"—কঠিন শপথ ধ্বনিত হল তার কথায়।

জলন্ত দৃষ্টি মেলে মীনাক্ষী বলল, "পারবে?"

অশোক মৃদু হাসল, "পারব, কিন্তু সে কে?"

মীনাক্ষী অসহায় ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল, "পারি না, তাকে দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে যে আমি তার নাম বলতে পারি না। কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে বাঁচাও, আমাকে রক্ষা করো তুমি। সে রাহু, একবার গ্রাস করেই সে থামবে ভেবেছো? না, সে বার বার আসবে—বার বার"

তুলে উঠল অশোক, বলল, "আমি তাকে শাস্তি দেব, তোমাকে বাঁচাব। কিন্তু কি করে? কেন তুমি তার পরিচয় লুকোচ্ছ মীনা?"

লুকোব না তা—শুধু আজ থাক। কাল তাকে নিয়ে আমি মাঠের সেই নির্জ্জন জায়গাটাতে থাকব। তুমি সন্ধ্যের পর ঠিক ছটার সময় যেয়ো, তাকে দেখো, শাস্তি দিও—শুধু তখনি তুমি বুঝতে পারবে যে কেন, কেন আমি তার নাম উচ্চারণ করতে পারছি না।

দুঃস্বপ্নের মত পীড়াদায়ক শীতের রাতটা যেন আর শেষ হতে চায় না। নরকের মত বিভীষিকাময় রাতটা দুটো রক্তারুণ ও নিদ্রাহীন চোখের সামনে ধীরে ধীরে, শেষ হয়ে গেল। ভোর হল। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল অশোক। কিছুতেই ভুলতে পারছে না সে। কে? কে সেই লোকটা? আচ্ছা, আজ সন্ধ্যেতেই তার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। কিন্তু তবু যেন সহ্য করা যায় না। জবার মত লাল চোখের সামনে নানা কুৎসিত ছবি ভেসে ওঠে। রাহুর মত ভয়ঙ্কর একটা লোক যেন মীনাক্ষীকে জড়িয়ে ধরেছে, তাকে চুম্বন করছে, ছিঁড়ে ফেলছে তার শাড়ী, ব্লাউজ, তার নিষ্কলুষ কৌমার্য্যের শুভ্রতাকে।

সময় কেটে চলল। পীড়াদায়ক অসহ্য সময় কেটে চলল।

দুপুর কেটে গেল।

বিকেলের দিকে হঠাৎ মীনাক্ষীকে বাড়ীতে দেখা গেল, সিঁড়ির গোড়ায়। সে নীচে নেমে যাচ্ছিল।

"তুমি!" অশোক বলল।

মীনাক্ষী মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ—মা পাঠিয়েছেন—মাসীমার কাছে"

"ওঃ"

"আমি যাচ্ছি"

"বসবে না?"

"না। কিন্তু আবার কোথায় দেখা হবে মনে আছে তো?"

অশোক মাথা নাড়ল, "আছে"

মীনাক্ষী সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, "সেইজন্যেই তো বসব না। আর শোন পেছন থেকে যেয়ো তুমি, বুঝলে।"

"আচ্ছা"

নীচে নেমে গেল মীনাক্ষী। দৃঢ় পদক্ষেপে।

অশোকের দুটো হাতের মুঠো লোহার বলের মত শক্ত হয়ে উঠল। মনে আছে বই কি—পরিষ্কার মনে আছে; সব মনে আছে। আজই সন্ধ্যেতে সেই শয়তানটার মুখোমুখী দাঁড়াবে সে, তাকে শাস্তি দেবে। চরম শাস্তি। তার রক্তে আছে সেই সব প্রাচীন জমীদারের হিংস্রতা, যারা রূপসী নারীর জন্য প্রাণ নিত আর প্রাণ দিত। ঠিক, সে ছাড়বে না।

সিঁড়ির দিকে কান পেতে রইল সে। বাবার নীচে নামার সময় হয়েছে। তিনি নীচে নামলেই সে তাঁর ঘরে যাবে। বিছানার পাশেই যে ছোট্ট টেবিলটা আছে তারি ওপরের ড্রয়ারটাতে আছে একটা সাইলেন্সারযুক্ত অটোমেটিক রিভলবার। সেটা তাকে নিতে হবে, দরকার হতে পারে।

শীতের সন্ধ্যা। পাঁচটা বাজতেই অন্ধকার হয়ে এসেছে। রাজপথের জনতা থেকে বেরিয়ে এল অশোক, মাঠের মধ্যে পা দিল। মিনিট পাঁচ সাত হাঁটলে পরেই সেই জায়গাটাতে পৌঁছে যাবে সে। কপালের দু'পাশের রগ দপ দপ করে লাফাচ্ছে; দেহের শিরাগুলো যেন ধনুকের ছিলার মত টানটান হয়ে উঠেছে, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত আর মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ওঠানামা করছে লাভা স্রোতের মত গরম রক্তের স্রোত। ট্রাউজারের পকেটের মধ্যে রেখেছে সে ডান হাতটা, ছুঁয়ে আছে রিভলবারের প্রান্তটা।

অতি দ্রুত অন্ধকারটা গাঢ় হচ্ছে। মাঠের ওপর কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার মত কুয়াসা। তা ভেদ করে চলল অশোক। দৃঢ় পদক্ষেপে, স্থিরদৃষ্টিকে সামনের দিকে প্রসারিত করে।

হঠাৎ সে থম্‌কে দাঁড়াল। এসে পড়েছে সে। আর দশ পনেরো হাত দূরে, কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে, একটা বেঞ্চিতে বসে আছে মীনাক্ষী। আর তার গা ঘেঁষে বসে আছে একজন লোক। সেই লোকটা। সেই ক্ষুধার্ত্ত রাহু।

দূরে একটা গ্যাস্‌লাইট জ্বলছে—তার বিবর্ণ, অস্পষ্ট আলোতে শুধু মীনাক্ষীকেই আব্‌ছা আব্‌ছা বোঝা গেল, লোকটাকে চেনা গেল না। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকাল অশোক, রেডিয়ম-যুক্ত কাঁটাটা জানাল যে ছ'টা বেজে দু'মিনিট হয়েছে। তাহলে ওরা আর কেউ নয়।

হঠাৎ মীনাক্ষী একটু ঘাড় ফিরিয়ে পেছনদিকে তাকাবার চেষ্টা করল। অশোককে বোধ হয় সে দেখতে পেল, সে মুখ ফিরিয়ে নিল, সেই সঙ্গে অশোকও আর একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল।

আব্‌ছা আব্‌ছা বোঝা যাচ্ছে যে লোকটা একেবারে যুবক নয়, তবে স্বাস্থ্যসম্পন্ন, ধনী, দুঃসাহসী। কে সে? দুর্নিবার কৌতূহলে দুলে উঠল অশোক, ডান হাতের মুঠোটা শক্ত করে রিভলবারটাকে চেপে ধরল। আচ্ছা, টের পাওয়াচ্ছে সে।

হঠাৎ সেই লোকটা মীনাক্ষীকে টেনে নিল নিজের দিকে।

মীনাক্ষীর গলা ভেসে এল, "না—"

পকেট থেকে রিভলবারটাকে বের করল অশোক। হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল। চক্রাকারে সব কিছু তার চোখের সামনে ঘুরে গেল। আদিম অরণ্যের হিংস্র আইনটাই পেয়ে বসল তাকে। রূপসী নারীদের জন্য যে সব মানুষেরা রাজ্য ভেঙ্গেছে, মানুষ খুন করেছে তাদেরি মত অন্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে দু'পা এগিয়ে গেল সে।

মীনাক্ষীর কথা আবার শোনা গেল—"না—না"—

সেই লোকটা হাসল, "কিন্তু আর কি বাকী আছে বল?"

গলাটা যেন চেনা। কিন্তু তার আগেই দুটো গুলি বেরিয়ে গেল।

সেই লোকটা সাতঙ্কে মীনাক্ষীকে ঠেলে দিল, একটা চাপা আর্ত্তনাদ করে পাক খেয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ঘন ঘাসের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তারপর আর কোন শব্দ হল না।

মীনাক্ষী বেঞ্চ থেকে উঠে অশোকের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। রিভলবারটা পকেটে রেখে দ্রুতপদে অশোক এগিয়ে গেল, সেই লোকটার মুখটা ঘুরিয়ে দেখতে চেষ্টা করল। আশেপাশে লোকজন নেই, গুলির আওয়াজও হয় নি। এক্ষুণি না পালালেও চলবে।

দূরে একটা গ্যাস্‌লাইট জ্বলছিল। প্রেতলোকের আলোকস্তম্ভের মত বিবর্ণ আলো বিকিরণ করছিল সেটা। তারি অস্পষ্ট, আব্‌ছা আলোতে অশোক তার শত্রুর মুখ দেখল। দেখে শিউরে উঠল, কাঁপতে লাগল সে।

মীনাক্ষী এগিয়ে এল, তার কাঁধে হাত দিয়ে মোলায়েম গলায় দ্রুতকণ্ঠে বলল, "শিগ্‌গীর—কেউ আসার আগেই পালাবে চল—"

মীনাক্ষীর দিকে তাকিয়ে অশোক যেন ভয় পেল। সে উঠে দাঁড়াল, দু'হাতে মীনাক্ষীকে ঠেলে দিল। যেন অপ্রত্যাশিত একটা বিভীষিকার সামনে এখন সে দাঁড়িয়েছে, তাকে পালাতে হবে। হঠাৎ সে ছুটতে আরম্ভ করল। ভূত দেখে মানুষ যেমনভাবে পালায় তেমনিভাবে।

"শুনছ—আমায় ফেলে যেয়ো না—শুনছ—" মীনাক্ষীর কাতর, ভয়ার্ত্ত কণ্ঠ ভেসে এল।

কিন্তু কে থামবে? আরো জোরে ছুটতে লাগল অশোক। আরো জোরে। ঘন কুয়াসার মাঝখান দিয়ে, নির্জ্জন মাঠের ঠাণ্ডা অন্ধকার ঠেলে! হ্যাঁ, ভয় পেয়েছে সে। মানুষ খুন করেছে বলে নয়, মানুষ খুন করার এই বৃত্তিটা তো তার রক্তের মধ্যেই ছিল। তার জন্য নয়, তার চেয়েও ভয়াবহ একটা কাণ্ড হয়েছে। মীনাক্ষীর জন্য সে তার বাপকেই খুন করেছে।

ছিন্নমস্তা

কোর্ট-কম্পাউণ্ড্‌কে দূর থেকে দেখা গেল। পাঁচিল-ঘেরা এলাকার মধ্যে কোর্টের নানা বিভাগ। বড় বড় অট্টালিকার ভিড়, ছোট শহরের মাঝে তা সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

মহাদেব বলল, "উই দেখা যাচ্ছে কোর্ট, বুঝলু ভিখারীর মা?"

বত্রিশ চৌত্রিশ বছরের একটি মেয়েলোক, অন্যান্য রাজবংশী মেয়েদের মতই দেখতে। শরীরের কাঠামোতে ভাঙন ধরেছে, তবু বোঝা যায় যে এককালে তার গঠন বেশ ভালো ছিল। রাজবংশী পুরুষের রক্ত তখন হয়ত উদ্দাম হয়ে উঠত তাকে দেখে; হয়ত নির্জন মধ্যাহ্নে, পুকুর থেকে চান করে ফিরবার সময় বাঁশবনের ছায়াঘন পথে কোনো দুঃসাহসী যুবক তাকে দুটো রসালো কথা বলার জন্য আকুল হয়ে উঠত। কিন্তু সেদিন আর নেই। এখন গাল দুটো ভাঙ্গা, মাথার চুল উঠে যাবার উপক্রম করেছে, ছোট্ট একটা গিঁঠ বেঁধে সেগুলো ঘাড়ের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে। পাহাড়ীদের মত ছোট ছোট চোখ, কিন্তু শীর্ণ আকৃতি হওয়ায় সেগুলো একটু বড় দেখায়, তাতে ঔজ্জ্বল্য নেই—আছে ঘোলাটে, প্রাণহীন ভাব। এককালে রং ফর্সা ছিল। কিন্তু এখন তা তামাটে। ছিল মাংসের পুরু আস্তরণ, কিন্তু রোদে-জলে আর অর্ধাহারে ও অনাহারে তা ক্ষয়ে গেছে; তার বদলে হাড়ের ওপর একটি পাতলা চামড়াই মাত্র অবশিষ্ট আছে। বিধবা, কিন্তু গায়ে যে এককালে অলঙ্কার শোভা পেত তার চিহ্ন রয়েছে কানের আর নাকের ওপর। পরনে তালি-দেওয়া, সযত্নে সেলাই-করা ময়লা, মোটা শাড়ী, হাঁটুর এক বিঘৎ নিচে পর্যন্ত গিয়েই তার দৈর্ঘ্য শেষ হয়ে গেছে। এই ভিখারীর মা।

মহাদেব বলল, "দেখ্‌লা, কোর্ট দেখ্‌লা ভিখারীর মা?"

ফুকফুক্ বিড়ি টানতে টানতে লোচন ঘোষ অবজ্ঞার সুরে বলল, "কোর্ট—তা কি এমন দেখার জিনিষ হে ?"

মহাদেব বিনীতভাবে বলল, "আয় বাপ্, কোর্ট কি যা-তা ব্যাপার গো মাহাজন ? আইনের কুঠি হইল ইটা—আয় বাপ্ !"

ভিখারীর মা কোনো কথা বলল না, শুধু নিঃশব্দেই চলতে লাগল, মন্থরগতিতে। কোর্টের দিকে দৃষ্টি ফেরাল সে, ত্রাস আর আতঙ্কের একটা কালো ছায়া ঘনীভূত হল তার চোখের তারায়, ফাটা-ফাটা কাল্‌চে ঠোঁট দুটো একটু নড়ে উঠল। যেন বিভীষিকা দেখল সে, যেন অতিকায় একটা রাক্ষস এসে দাঁড়াল তার মুখোমুখি। কোর্ট ! আয় বাপ্ !

ভাদ্র মাসের রোদ ইতিমধ্যেই বেশ চন্‌চনে হয়ে উঠেছে। গায়ে জ্বালা করে, ঘাম হয়, দু'পাশের রগ দপ্ দপ্ করতে থাকে। সূর্যালোক-প্রতিফলিত আয়নার মত নির্মেঘ আকাশটা, তার দিকে এই বেলা দশটার সময়েই আর তাকাবার উপায় নেই। কোর্টের ফটক দিয়ে উকিল, মোক্তার, মক্কেল, কেরানী এরই মধ্যে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে ; ফটকের বাইরে বসে গেছে দোকানদারেরা তাদের মনিহারী জিনিস নিয়ে, কলা কমলা ও বিড়ি দেশ্‌লাই নিয়ে।

তেলতেলে ঘামে ভিখারীর মার মুখটা চক্‌চক্ করছে। ললাটের ওপর ও চোখের কোণে কুঞ্চিত রেখা দেখা দিয়েছে। কি যেন ভাবছে সে।

মহাদেব তার ছেঁড়া শার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বিড়ি খুঁজছে। কিন্তু কোথায় বিড়ি ? ছাপোষা মানুষ, চার আনার বেশী পয়সা আনতে পারেনি, বৌ খেঁকিয়ে উঠেছিল। সেই চার আনা পয়সা চট্ করে খরচ করতে মন চাইছে না তার। ট্রেনভাড়া দিয়েছে ভিখারীর মা, তার কাজে এসেছে বলে, কিন্তু সব অবস্থা জানার পর মহাদেব তার কাছে বিড়ির খরচা চায় কি করে ? অথচ একটা বিড়ি চাই-ই এখন।

কাঁচাপাকা চুলের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে সে লোচন ঘোষের দিকে তাকাল।

পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, গায়ে গলাবন্ধ কোট, কাঁধে সিল্কের চাদর, গলায় তুলসীর মালা, কদমছাঁট পাকা চুলে ভর্তি মাথায় দোহারা গড়নের একটা টিকি আর শকুনির মত তীক্ষ্ণ, কুটিল চাউনি ও শীর্ণ আকৃতি। এই লোচন ঘোষ। এক হাজার বিঘার জোতজমি আছে যার, যার রহনপুরে আছে চালু গোলা। সেই লোচন ঘোষ এখন বাঁ বগলে ছাতাটা চেপে ধরে হাঁটছে। ছাতাটা পুরানো—কারণ তার কালো কাপড়ের রং এখন ছাইয়ের মত হয়ে এসেছে আর এখানে সেখানে মার্কিন কাপড়ের পট্টি পড়েছে। হাঁটছে আর ফুক্‌ফুক্ করে বিড়ি টানছে লোচন ঘোষ।

মহাদেব ক্ষীণকণ্ঠে ডাকল, "মাহাজন"—

লোচন ঘোষ তাকাল, "কি বলছিস রে ?"

যেন কোনো রাজার গোটা রাজ্যকেই সে অন্যায়ভাবে চাইছে—এমনি একটা অপরাধীর ভাব ফুটে উঠল মহাদেবের মুখে। প্রায় অস্ফুট গলায় সে প্রার্থনা জানাল, "একটা বিড়ি দ্যান না গো মাহাজন"—

লোচন ঘোষ কট্‌মট্ করে তাকাল মহাদেবের দিকে। জ্বলন্ত বিড়িটাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে মহাদেবের হাতে দিল, শ্লেষোক্তকণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "পরের ঘাড় ভেঙ্গে কি নেশা চলেরে হতভাগা—এঁ্যা ?"

বিড়িটা মুখে দিয়ে সলজ্জ হেসে মহাদেব বলল, "দেশ্‌লাইটা মাহাজন"—

"দেশ্‌লাইটাও রাখিস্ না রে গাড়োল—তুই কি !" জ্বলন্ত বিড়িটাকে এগিয়ে দিল লোচন ঘোষ।

মহাদেব সযত্নে বিড়িটা ধরিয়ে নিল।

কোর্টের ফটকটা এসে পড়ল। হঠাৎ ভিখারীর মা থম্‌কে দাঁড়াল,

তার শরীর যেন অবশ হয়ে এল, একটা বিরাট অজগরের মুখের মত মনে হল ফটকটাকে। তার আতঙ্কবিহ্বল ঘোলাটে চোখের ওপর একটা জলের পরদা চিক্‌চিক্ করে উঠল।

লোচন ঘোষ এগিয়ে গিয়েছিল। পেছন ফিরে ভিখারীর মাকে দাঁড়াতে দেখে সে বিরক্ত হয়ে বলল, "ওকি, দাঁড়ালু ক্যানে রে ভিখারীর মা—আয়, আয়, টাইম হয়া গিছে যে"—

নড়ে উঠল ভিখারীর মা, পা টেনে টেনে চলতে লাগল সে—খোঁড়া কুকুরের মত। অসহায়, যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টিটা সামনের দিকে প্রসারিত। দেখে মনে হল যেন বধ্যভূমিতে প্রবেশ করেছে সে, যেন কোনো ঘাতকের খড়্গকে দেখতে পেয়েছে, অনিবার্য একটা বিয়োগান্ত পরিণতির আঁচ পেয়ে যেন তার প্রাণটা সভয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সাব-রেজিস্ট্রারের দপ্তরখানা। একতলা বাড়ীর চারটে ঘর জুড়ে তাঁর অফিস। জমি কেনাবেচার নাটকীয় ব্যাপারটা এই ঘরগুলোতেই ঘটে আসছে বহুদিন ধরে। অফিসের বাইরের দেয়াল লাল রংয়ের। বাইরে আম গাছ আছে তিন চারটা, সে-গুলির ডালে কাক আর বকের বাসা। গাছের নিচে ছেঁড়া মাদুর আর সতরঞ্চি বিছিয়ে মুহুরিরা বসে আছে। তাদের সামনে ছোট ছোট জলচৌকি, স্ট্যাম্প-যুক্ত দলিলের কাগজ, কালির কাঁচের দোয়াত, মোটা নিবের কলম আর ছেঁড়া ব্লটিং কাগজ। ইতিমধ্যেই ভিড় জমেছে সেখানে। মাদুর আর সতরঞ্চির একপাশে মাটির ওপর উবু হয়ে বসে আছে ক্রেতা বিক্রেতারা। হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই। মুখের চেহারা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়—কে জমি কিনছে আর কে বিক্রি করছে। একদলের শুক্‌নো মুখ, উদাস দৃষ্টি; অন্য দলের উজ্জ্বল মুখ, চঞ্চল দৃষ্টি। সেখান থেকে কয়েক হাত দূরে একটা লোক চানাচুর বিক্রি করছে; তার পাশে আর একটা লোক বসে আছে চিড়ে, ছাতু, গুড়, নুন, লঙ্কা আর জল ও বাসন নিয়ে।

সেখানেই ওরা এসে দাঁড়াল।

লোচন ঘোষ চারদিকে তাকাল। চেনা মুহুরি পেলেই কাজটা তাড়াতাড়ি হবে। কম দিলেও চলবে, আবার ধরাধরি করে হাকিমের কাছে তাড়াতাড়ি কবালাটাকে পেশ করাও যাবে।

একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে কালোমত যে লোকটা বিড়ি টানতে টানতে অন্যান্য মুহুরিদের কর্মব্যস্ততার দিকে তাকিয়ে ছিল আর মনে মনে শাপশাপান্ত করছিল সে হঠাৎ লোচন ঘোষকে দেখতে পেল। তার ওখানে একটা লোকও তখন ছিল না। খুব উৎসাহিত হয়ে, পরমাত্মীয়ের মত মিষ্টি গলায় সে হাঁক দিল, "আচ্ছা, ঘোষমশাই যে! আসুন, আসুন, নমস্কার"—

লোচন ঘোষ দেখতে পেল কালো লোকটাকে। নরহরি দাস। ব্যস্, চেনা লোক পাওয়া গেছে আর লোকটা কাজও করে ভালো।

"কি নরহরি, ভালো আছো তো?"

"তা আপনাদের আশীর্বাদে আছি একরকম। তারপর, কি ব্যাপার? আহা, বসুন, বসুন—" নরহরি হঠাৎ গোঁড়া বৈষ্ণবের মত উদার ও ব্যস্ত হয়ে উঠল।

লোচন ঘোষ তাকাল ভিখারীর মার দিকে, বলল, "বস্ গো ভিখারীর মা—এইঠি বস্"—

ভিখারীর মা কোনো কথা বলল না। সতরঞ্চির বাইরে, বিরল ঘাসে ঢাকা মাটির উপর সে বসে পড়ল—হাঁটুর ওপর ডান কনুই রেখে, গালে হাত দিয়ে। তার দৃষ্টিটা সামনের মানুষ ও কোর্টের দেয়াল ভেদ করে, শহর পেরিয়ে, মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে চলে গেছে; গিয়ে থেমেছে তার বিন্নাঘাসের ছাউনি-দেওয়া ছোট্ট মাটির ঘরে। সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যে তার মধ্যে ম্লানমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ভিখারী, ন্যাড়া আর কানু। ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ভাবছে মায়ের কথা। একটু নড়ে উঠল

ভিখারীর মা, ছেলেমেয়েদের ছবিটাকে সে যেন সহ্য করতে পারল না, দৃষ্টিটাকে সে ফিরিয়ে নিল, নিঃশব্দে এবার মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

মহাদেব সতরঞ্চির এককোণে বসে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আইনের কুঠি ইটা, কোর্ট, আয় বাপ্!

লোচন ঘোষ বলল, "একটা কবালা করা ছ্যাও নরহরি, দু'বিঘা পাঁচ কাঠা মাটির।"

"কার নামে?"

"ভিখারীর মার নামে—হঁ্যারে, তুর কি নাম লেখা হবু ভিখারীর মা?"

ভিখারীর মা যেন চম্‌কে উঠল, তাকাল লোচন ঘোষের দিকে, মাথার ওপরকার কাপড়টা একটু টেনে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, "গঙ্গা—গঙ্গা-কুমারী বর্মণ"—

"ইস্‌ট্যাম্পের দাম দিন ঘোষমশাই"—নরহরি হাত পাতল।

লোচন ঘোষ টাকা বের করে দিল। নরহরি একটা দলিলের কাগজ টেনে লিখতে আরম্ভ করল।

চিড়ে আর গুড়ের দিকে তাকিয়ে ছিল মহাদেব, ভিখারীর মার দিকে মুখটা ঘুরিয়ে সে বলল, "শুইন্‌ছ গো ভিখারীর মা, শুইন্‌ছ"—

ভিখারীর মা তাকাল। নিঃশব্দে।

"খিদা লাইগ্‌ছে যি"—

ভিখারীর মা লোচন ঘোষের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, "দুই তিন আনা পাইসা ছ্যান গো মাহাজন—মহাদেবদা চিড়া খাভে"—

খেঁকিয়ে উঠল লোচন; কুৎসিত মুখভঙ্গি করে বলল, "এ্যাখ্‌খনি খাভে? ক্যানে? বলি বেলা আর কি এমন হইল রে?"

মহাদেব তবু বলল, "বাঃ, খিদা লাইগ্‌ছে তো করমু কি?"

"ব্যাটা গাড়োল কোথাকার"—পকেট থেকে দু'আনা পয়সা বের করে মহাদেবের দিকে তা ছুঁড়ে দিল লোচন ঘোষ।

তা কুড়িয়ে নিয়ে মহাদেব বলল, "ইয়াতে কি হবু? আর এক আনা খ্যান"—

"যা যা ব্যাটা রাক্ষস কোথাকার, দু'আনার চিড়া খায়া জল খাগা, প্যাট ঢাক হয়া উইঠ্‌বে।"

"না না, খ্যান"—নাছোড়বান্দার মত মাথা নাড়ল মহাদেব।

কি একটা অশ্লীল কথাকে আট্‌কে নিল লোচন ঘোষ। একটু ভেবে নিয়ে আরো দু'আনা পয়সা বের করে বলল, "লে, চাইর্‌ আনার চিড়া কিনা লে—ভিখারীর মাকেও দিস্"—

"না"—ভিখারীর মা যেন শিউরে উঠল, অস্ফুটকণ্ঠে বলল, "হামি খাবু না যি"—

মহাদেব বাকী পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে উঠে গেল, চিড়ের দোকানের দিকে।

নরহরি জিজ্ঞেস করল, "কত দর গো ঘোষমশাই?"

লোচন ঘোষ মহাদেবের উদ্দেশ্যে গালিবর্ষণ করল, "শালা"—

নরহরি ভ্রূকুঞ্চিত করল, "মানে?"

লোচন ঘোষ হাসল, "আহা, তুমাকে লা হে, উই শালা গাড়োলটাকে বুলছি। দর? তা লেখ একশো টাকা করা। দু'বিঘা পাঁচ কাঠার দাম হইল তোমার গিয়া তবে দু'শো পঁচিশ টাকা, ঠিক কিনা?"

নরহরি লিখতে লিখতে মাথা ঝাঁকাল, "হুঁ, ঠিক। হঁ্যা, ভিখারীর মার স্বামীর নাম কি?"

ভিখারীর মা লোচন ঘোষের দিকে তাকাল।

লোচন ঘোষ বলল, "নিতাই বর্মণ—মারা গিছে।"

"আচ্ছা এবার খতিয়ান দেখি—"

ভিখারীর মা নিজের আঁচলের গিঁঠ খুলে দুটো জীর্ণ, ভাঁজকরা কাগজ বের করে দিল। একটা খতিয়ান, অপরটা চেক দাখিলা। নরহরি সেগুলো খুলে সামনে রাখল, তারপর আবার লিখতে লাগল।

মাটির দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল ভিখারীর মা। এখানকার মাটি একটু কালো. একটু কাঁকর-মেশানো। তবু মাটি। শান্ত, সহিষ্ণু, মমতাময়ী মায়ের মত। ছবি ভাসে ভিখারীর মার ঘোলাটে চোখের সামনে। মেহেরপুর গ্রাম থেকে এক মাইল দূরে, ডাঙ্গাপাড়ার উত্তর দিকে, সাতটা তাল গাছ যেখানে সপ্তরথীর মত মাথা খাড়া করে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে—সেখানটাতেই বিস্তৃত হয়ে আছে দু'বিঘা পাঁচ কাঠা মাটি। সরকারী পুকুরটার উঁচু পাড় ঘেঁষে পূবে পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে আছে তা। মাখনের মত নরম, সাদা বীজকে সতেজ চারায় পরিণত করার উপযুক্ত, ঐন্দ্রজালিক প্রাণরসে ভরাট ও উর্বর। বিস্তৃত হয়ে আছে মাটি শরতের আকাশের নিচে, ভাদ্দুরে রোদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আর সেই মাটিকে আজ বিক্রি করছে ভিখারীর মা। বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে সে। কেন? হাসল ভিখারীর মা। সে এক বিচিত্র কাহিনী।

স্তিমিত হয়ে এল তার চোখের দৃষ্টি। কুটিল স্রোতের নাগপাশ যেন তাকে টেনে নিচ্ছে কোনো অতল নদীর গর্ভে। ডুবে মরার আগে সমস্ত জীবনটা যেমন ছায়াছবির মত চোখের সামনে ভিড় করে আসে তেমনিভাবে সব কিছু দেখতে পেল ভিখারীর মা।

ছিল, সব ছিল। জোয়ান স্বামী, কোলভরা ছেলেমেয়ে, সারা বছরের ধান আর পরনের কাপড়—কোনো অভাবই ছিল না। জমি ছিল—পাঁচ বিঘা পাঁচ কাঠা। এক জোড়া বলদ করেছিল নিতাই, নিজেই হাল চালাত। সবুজ চারা মাথা বের করত মাটির ভেতর থেকে, বড় হত, সবুজ শোভায় ঝলমল করত, হাওয়ায় দুলত, ক্রমে পেকে সোনার মত রং হত তার। তারপরে ধানকাটা, মাড়াই, সেদ্ধ করা, ঢেঁকিতে কুটে চাল তৈরী করা। পঁচিশ থেকে ত্রিশ মণ ধান হত জমিতে। দু'তিন কাঠা জমিতে তরিতরকারিও চাষ করত নিতাই, তা নিয়ে হাটে বিক্রি করত। অবসর সময়ে দড়ি পাকাত, আমের সময় বাগান থেকে আম কিনে চড়া

দামে হাটে বেচত। বেশ চলে যাচ্ছিল দিন। সে প্রায় আঠারো বছর আগেকার কথা, যখন তার বিয়ে হয়েছিল নিতাইয়ের সঙ্গে। তারপরে দুটো ছেলে হল পর পর। মারা গেল তারা। সুখে দুঃখে দিন কাটতে লাগল। দিনের বেলা স্বামী ক্ষেতে, হাটে কাজ করত; সে রান্না করত, ঘর লেপত, বাসন মাজত, মা লক্ষ্মীর পুজো করত। আর রাতের বেলা সব সেরে টেরে স্বামীর বলিষ্ঠ বাহুর আশ্রয়ে গিয়ে ঘুমোত। ছোট শিশুর নির্ভরশীল ভাবটা তার মুখে ফুটে উঠত। ঠোঁটের কোণে দেখা দিত পরিতৃপ্তির মিষ্টি হাসি। স্বামীর বুকে মিশিয়ে গিয়ে সে তখন গভীর রাতের নূপুরধ্বনি শুনত, শুনত শেয়ালের প্রহর-ঘোষণা—

নরহরি দাস তখন লিখে যাচ্ছে আর যা লিখছে তা বিড়বিড় করে আউড়ে যাচ্ছে, "জিলা মালদহ, থানা গোমস্তাপুর, মৌজা নিমইল, পরগণা চাঁদলাই, খতিয়ান নং ১৩৫, তৌজি নং ৩২"—

লোচন ঘোষ আর একটা বিড়ি ধরিয়ে ফুক্‌ফুক্ করে টানতে লাগল, দেখতে লাগল নরহরির কলম-চালনা।

মহাদেব ফিরে এল চিড়ে-গুড়ের দোকান থেকে, এসে একটা ঢেকুর তুলে বলল, "আঃ"—

"কি রে, খালু?" লোচন ঘোষ প্রশ্ন করল।

"হঁা মাহাজন"—মহাদেব সহাস্যে মাথা নাড়ল।

"ভিখারীর মার চিড়া কুথায়?"

মহাদেব লজ্জা পেল, "বাঃ ভিখারীর মা যি বুলল উ খাভে না—তাইতো হামি সব খায়া লিলাম্"—

"একা খালি!" লোচন ঘোষ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল, "একা! আচ্ছা তুই কি? এ্যাঁ?" আর কোনো কথা বলল না, প্রচণ্ড রাগে একেবারে বোবা হয়ে গেল সে। বেটা রাক্ষস, নির্ঘাত রাক্ষস।

ভিখারীর মা ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, "রাগ কইরো না গো মাহাজন, হামি তো খামু না"—

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু দু'জনার খাবার যে একাই"—

লোচন ঘোষ কথা শেষ করতে পারল না।

নরহরি হঠাৎ ওপরের দিকে মুখ তুলে গাল দিল, "শালা"—

"কি হইল হে নরহরি, এঁ্যা ?" লোচন ঘোষ ভুরু কুঁচকাল।

নরহরি দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "আপনাকে নয় ঘোষ মশাই—শালা কাগকে বলছি"—

"কি হইল ?"

"শালার কাগ ওপর থেকে ইয়ে করেছে, আর একটু হলেই মাথায় পড়ত"—

মহাদেব সশব্দে হেসে উঠতে গিয়েই থেমে গেল। কাজ নেই, মহাজন হয়তো রাগ করবে, অথচ তাকে রাগানোটা উচিত হবে না। স্বার্থ আছে তার।

"মাহাজন"—সে ডাকল।

"কি ?"

খুব বিনীত ও অনুগত লোকের মত নিরীহ ভঙ্গিতে মহাদেব বলল, "একটা বিড়ি ছ্যান"—

"বিড়ি !" লোচন ঘোষ তেতে উঠল, "আমি কি বিড়ির দানছত্তর খুলেছি নাকি রে, এঁ্যা ? বিড়ির নেশা অথচ বিড়ি রাখবু না সাথে—ইটা কি কাণ্ডরে বাপু !"

"ছ্যান মাহাজন, খায়া আইলাম বুলা চাহছি"—মহাদেব সত্যি নির্লজ্জ।

"তবে লে, খায়া মরু হতভাগা"—বিড়ি ও দেশ্‌লাই বের করে এগিয়ে দিল লোচন ঘোষ।

মহাদেব বিড়ি ধরাতে ধরাতে হেসে বলল, "কিন্তু কথাটা যমে শুইন্‌লে তো মাহাজন, হামি আর হামার বৌ কি উ কথা কম কহাছি যমকে—

কিন্তুক্ নাঃ, ফল হয় না”—কথাটা বোঝাবার জন্য বারকয়েক মাথা নাড়ল সে।

“হয়েছে বাপু তুই থাম্, আর ঠাট্টার দরকার নাই”—

মহাদেব বুদ্ধিমানের মত চুপ করে গেল, নিঃশব্দে বিড়িটাকে সজোরে টানতে লাগল।

ভিখারীর মা মাটির দিকে তাকাল। নরম মাটি। তার মনে পড়ে—সপ্তরথীর মত সাতটা তাল গাছ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই তার জমি; দু'বিঘা পাঁচ কাঠা। ঢেউখেলানো ক্ষেতের শেষে যেখানে আকাশটা এসে মাটি ছুঁয়েছে সেখানে যখন কাকের ডানার মত কালো মেঘের পাহাড়কে দেখা যায়, যখন একটা কালো ছায়ার আবরণ পড়ে সেই জমির ওপর তখন তার অপরূপ শোভা দেখে মন জুড়িয়ে যায়; ফসলের সম্ভাবনায় নিঃশ্বাস ভারী হয়ে ওঠে। আর তারপর যখন আকাশ ভেঙ্গে জল পড়ে, শুকনো, সাদা ও কঠিন মাটির ভিজে গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে তখন দেহে রোমাঞ্চ জাগে, মনের নিভৃত কন্দরে একটা অনুভূতি জাগে যে মাটি আর মানুষ আলাদা নয়। তখন বিশ্বাস জন্মায় যে মাটিও মানুষের একটা অঙ্গ, মাটি ছাড়া মানুষ বাঁচতেই পারে না। অথচ সেই মাটি আজ—। কিন্তু কেন?

সব ছিল। নদীর মত যে জীবন তার ওপর তারা নৌকো ভাসিয়ে চলেছিল। ঝড় উঠেছিল, বান ডেকেছিল সেই নদীতে, কুটিল কামনা নিয়ে ঘূর্ণাবর্ত এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল—কিন্তু তবু তাদের নৌকো ডোবেনি। দিন কাটছিল এমনি ভাবে। আবার সন্তান এল, একের পর এক—ভিখারী, ন্যাড়া, কানু। তারপরে হঠাৎ একদিন প্রলয়ের অন্ধকার এল গঙ্গাকুমারীর জীবনে। নিতাই মারা গেল—অনেক ভুগে, অনেক খরচ করে, বৌ ও ছেলেমেয়েদের অসহায় অবস্থায় ফেলে।

নরহরি লিখছে, “আপনি ও আপনার বংশধরগণ উক্ত জমির রায়তি স্থিতিবান স্বত্বের অধিকারী হইলেন”—

ভিখারীর মার হাতের নীল্‌চে শিরগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চাপা উত্তেজনায় নাকটা ফুলে উঠেছে। মানস চক্ষে সেই দুর্দিনের ছবিটা যেন দেখতে পেল সে যেদিন তার সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল, হাতের শাখা ভেঙ্গে গেল। ভিখারী সেদিন আট বছরের, ন্যাড়া ছয় বছরের, কানু তিন বছরের। ঠিক তখন থেকেই অবস্থাটা তাড়াতাড়ি বদলাতে আরম্ভ করল। একটা পিচ্ছিল সুড়ঙ্গ-পথ বেয়ে সেদিন থেকেই রসাতলের অন্ধকারের দিকে নামতে লাগল ভিখারীর মা। তার একাকীত্বের সুযোগ পাবার জন্যই যেন ওৎ পেতে ছিল সব বিপদগুলো। ভবিষ্যতের কোঠা থেকে একের পর এক তারা আত্মপ্রকাশ করতে লাগল।

মেহেরপুরে গো-মড়কের ধুম পড়ে গেল। নিতাই বর্মণের বলদ দুটো রাতারাতি মারা গেল। স্বামী মারা যাওয়ার সময় যতটা কেঁদেছিল ভিখারীর মা তার চেয়েও বেশী কেঁদেছিল সে জানোয়ার দুটো মারা যাওয়ায়। বাধ্য হয়ে জমি বন্দোবস্ত করতে হল। মহাদেবের ছোট ভাই অবস্থাপন্ন চাষী, সে আধি চাষ করতে রাজী হল, খাতির করল না বিধবা মানুষটিকে। উপায় কি ? কে আছে তার ? ছেলেরা তো নাবালক।

গাঁয়ের সবচাইতে বড় জোতদার ছিল সুরেন তালুকদার। বয়স গোটা চল্লিশেক, কালো মোটামত লোকটা—স্বার্থপর, জালিয়াত, লম্পট। আর তার কাছে কিছু ঋণ ছিল নিতাইয়ের। প্রায় পঞ্চাশ টাকা। আর এই ঋণটা শোধ না করেই নিতাই মারা গেল।

একদিন দুপুরে খাওয়ার সময় হঠাৎ সুরেন তালুকদার সামনে এসে দাঁড়াল। ঘোমটা টেনে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল ভিখারীর মা, কিন্তু তালুকদার ডাক দিল।

"শোনো বাছা—তুমিই কি নিতাইয়ের বৌ ?"

ভিখারীর মা মাথা নেড়ে জানাল, "হ্যাঁ।"

সুরেন তালুকদার উদার হাসি হেসে বলল, "নিতাই অকালে মারা

গেল, শুনে আর দুঃখে বাঁচি না। তা গাঁয়ের মানুষ, তোমরা তো আত্মীয়ের সামিল, দরকার হলে জানাবা কিন্তু”—

আবার ঘাড় নেড়ে সেখান থেকে চলে এসেছিল ভিখারীর মা।

এল ব্যাধি। ছেলেমেয়েরা একের পর এক অসুখে পড়ল।

মহাদেবের ছোট ভাই নারায়ণ আধির হিসেবে ধান দিল মাত্র বারো মণ। চোখে অন্ধকার দেখল ভিখারীর মা। মনে হল পৃথিবী বড় প্রতিকূল, বড় অন্ধকারে ভরা। তবু সাহস হারাল না, ছেলেমেয়েদের মানুষ করে একদিন সে দুঃখকে জয় করবে—এমনি স্বপ্নই দেখতে লাগল। তরিতরকারির চাষ স্বামীর মত ভালোভাবে সে আর করতে পারল না, হাটেও নিয়ে যেতে পারল না, গাঁয়েই কম দামে বেচে দিতে লাগল। সুতরাং টান লাগল। এরই মাঝে একদিন বৈশাখ মাসে ঝড় উঠল! অদৃশ্য দৈত্যলোক থেকে যেন হাজার হাজার দৈত্য ছুটে এল, গাছপালা উপড়ে ফেলল, বাড়ীর চাল উড়িয়ে নিয়ে গেল, তা চাপা দিয়ে মানুষ গরুর প্রাণ নিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিখারীর মার বাড়ীর চালটাও উড়িয়ে নিয়ে ফেলল পাঁচশ হাত দূরে। টাকার দরকার হল।

গুটিগুটি পা ফেলে একদিন সুরেন তালুকদারের কাছে যেতে হল।

তালুকদার তার দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, “টাকা চাই? তা বেশ। কিন্তু নিতাই এর আগে পঞ্চাশ টাকা দেনা করেছিল, সেটা জানা আছে তো?”

ভিখারীর মা ঘাড় নাড়ল।

“সেই দেনা এখন সুদসমেত দাঁড়িয়েছে প্রায় একশো বাইশ টাকায়।”

যে ভিখারীর মা লজ্জায় ঘোমটা টেনে ছিল, কম কথা বলছিল—সেই হঠাৎ একটু ঘোমটা সরিয়ে কথা বলে ফেলল। বলল, “এত!”

তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তালুকদার, তার

দুটো পিঙ্গল চোখের তারায় আগুন ঝল্‌সে উঠল, ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণে।

খুব মোলায়েম স্বরে সে বলল, "হ্যাঁ, তাই। এ তো আজকের কথা নয়, প্রায় দু'বছর আগেকার কথা, কাগজপত্রও আছে; সে যাই হোক্, তুমি ঘাব্‌ড়াচ্ছ কেন? অল্প অল্প করেই না হয় দেবে। আর এই নাও, কুড়িটা টাকা নিয়ে যাও আজ, আবার দরকার হলে দেব"—

কা-কা-কা—। কাকের কর্কশ চীৎকার শোনা গেল। ভিখারীর মার চমক ভাঙ্গল।

নরহরি একেবারে লাফিয়ে উঠল, "সেরেছে। শালার কাগ এবার জামার ওপর ইয়ে করেই ফেলেছে"—একটা শুক্‌নো পাতা কুড়িয়ে সে জামার হাতাটা মুছে ফেলল, তারপর বলল, "নিন ঘোষমশাই, হয়ে গেছে কবালাটা, একবার পড়ে দেখুন"—

"তুমিই পড় বাপু, আমি শুনি"—লোচন বলল।

নরহরি পড়ে শোনাল। ভিখারীর মাও শুনল। সব কথা বুঝল না সে, তবু যেটুকু বুঝল তাতেই দেহ তার অবশ হয়ে এল। মরছে, তিল তিল করে মরছে সে, করাত দিয়ে কে যেন তার গলাটাকে রসিয়ে রসিয়ে কাটছে।

"নিন, এবার ভিখারীর মা আর সাক্ষীকে দিয়ে সই করান"—

মহাদেব হাসল, "আয় বাপ্, হাম্‌রা কি লিখা পড়হা জানি যি?"

লোচন ঘোষ মোড়লের মত বলল, "আরে না না, টিপসই দিবু তুরা"—

নরহরি কালির প্যাড বের করল। ভিখারীর মা ও মহাদেবের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ নিয়ে নিল কবালার ওপর। যন্ত্রচালিতের মত ছাপটা দিল ভিখারীর মা, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে, যেন দেহের কয়েক ফোঁটা রক্ত জমে আছে টিপসইটাতে।

"ব্যস"—নরহরি বলল, "এবার আপনি খেয়েদেয়ে আসেন ঘোষমশাই।

ওরা থাক্, আমি কবালা দাখিল করে দিচ্ছি, পেশ্‌কার বাবুকে বলে দিচ্ছি যাতে হাকিমের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছয়"—

"আচ্ছা"—লোচন ঘোষ উঠে দাঁড়াল, মহাদেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুরা গিয়া বারান্দায় বস্, আমি খায়া আইস্‌ছি।"

মহাদেব মাথা নাড়ল, "আচ্ছা মাহাজন"—

"ভিখারীর মা খাবু না ?" লোচন ঘোষ একবার ফিরে তাকাল যেতে যেতে।

ভিখারীর মা নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। না, না। খাবার রুচি নেই তার, নেই মনে আলো। অন্ধকার, সব কিছু অন্ধকার ঠেকছে। কবালা তৈরী হয়ে গেল, টিপসই দিল সে। এবার হাকিমের সই। তারপর ? তারপর নিরন্ধ্র অন্ধকার।

নরহরি তার চেনা পেশ্‌কারকে কবালাটা দিয়ে এল, হাকিমের কাছে তাড়াতাড়ি পেশ্ করার জন্য। ওদের দু'জনকে সে বারান্দায় উঠে বসতে বলল। যে কোন মুহূর্তে নাম ডাকবে হয়ত। মহাদেব মাঝে মাঝে উঠে ঘুরে আসতে লাগলো এদিক ওদিক। ভিখারীর মা নিঃশব্দে পাথরের মত এক কোণে বসে রইল। ভাবতে লাগল—এটা শরৎকাল, তার সাতটা তালগাছ-ওয়ালা ক্ষেতের ওপর এখন চড়া রোদ ছড়িয়ে পড়েছে, শিশির-ভেজা ধানের চারাগুলো দুলছে একটু একটু, শ্যামশোভায় ঝক্‌মক্ করছে। বাতাসে ভাসছে চড়ুই আর শালিকের ডাক, কাঁচা ধানের মৃদু সুবাস, অদৃশ্য প্রাণের স্রোত। অথচ—অথচ এই ধান, এই মাটি আর তার থাকবে না—কেন ?

কত কথা, কত অপমান, কত নির্যাতন সত্ত্বেও সে এই মাটিকে আঁকড়ে ছিল। কিন্তু কি হল ?

বেশ মনে পড়ছে। যখন তখন সুরেন তালুকদারের সঙ্গে দেখা হতে

লাগল। রাস্তায়, ঘাটে, বাড়ীর সামনে। এদিকে দিনের পর দিন অভাবের মাত্রা বেড়ে গেল। খাওয়ার পরিমাণ কমল, পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেল। শেষে একদিন এক কাণ্ড ঘটল।

শীতের রাত। দিনের বেলাকার ভাত ছেলেমেয়েদের খাইয়ে ভিখারীর মা শুধু জল খেল চারটি মুড়ি দিয়ে। ছেলেমেয়েরা ঘুমোল। গাঁয়ের গুঞ্জনধ্বনি থেমে এল, কুয়াসা আর ঠাণ্ডা হাওয়ায় বাইরের পৃথিবীটা যেন জমে এল।

এমনি সময় দরজায় ধাক্কা পড়ল।

"কে ?" শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল ভিখারীর মা।

জবাব এল, "আমি—দরজা খোল, জরুরী কথা আছে"—

বিবর্ণ হয়ে উঠল ভিখারীর মা। স্থরেন তালুকদারকে কে না চেনে? সেই লোকটা এত রাতে কি বলতে চায় ?

"খোল"—আদেশের স্থরে বলল তালুকদার।

হতবুদ্ধি হয়ে দরজা খুলল ভিখারীর মা।

স্থরেন তালুকদার সামনে এসে বলল, "ঘাবড়ো না, কয়েকটা কথা মাত্তর, কিন্তু বড় শীত বাইরে, একটু ভেতরে দাঁড়িয়েই না হয় কথাগুলো বলে যাই"—

কোনো উত্তরের জন্ম অপেক্ষা না করেই ভেতরে ঢুকল তালুকদার, ঢুকেই দরজাটা ভেজিয়ে হেসে বলল, "কন্‌কনে হাওয়া আসছে ভিখারীর মা—ভয় পেয়ো না।"

আশঙ্কায় কেঁপে উঠল ভিখারীর মা, তালুকদারের মুখের ক্লেদাক্ত হাসিটা তার দৃষ্টি এড়াল না, ভাঙ্গাগলায় সে প্রশ্ন করল, "আপনার কি দরকার, বুলেন"—

তালুকদার মাথা নাড়ল, গম্ভীর হয়ে বলল, "বলছি শোন। আমার হঠাৎ টাকার দরকার পড়েছে। তোমাদের কাছে আমার একশো বিয়াল্লিশ টাকা পাওনা—সেটা আজই দিতে হবে"—

"আজই!" টলে উঠল ভিখারীর মা। আজই! আর একশো বিয়াল্লিশ টাকা!

সুরেন তালুকদারের মুখের চেহারাটা বদ্‌লে যেতে লাগল, বিষধর সাপের চোখের মতই তার দুটো চোখ জ্বলতে লাগল। তার মিষ্টি হাসি আর উদার ভঙ্গির মুখোসটা সরে গিয়ে যেন ভেতরকার কুৎসিত চেহারাটাকে উদ্ঘাটিত করে দিল।

কঠিনকণ্ঠে সে বলল, "হ্যাঁ আজই চাই, এখুনি চাই।"

"তা কি করা হয় গো মাহাজন—হামি মেয়ালোক, এই রাতে কি করমু?" কাতর হয়ে বলল ভিখারীর মা।

"সে আমি জানি না"—দরজার সামনে একটা দৈত্যের মত কালো ছায়া ফেলে সুরেন তালুকদার মাথা নাড়ল।

"আর এত টাকা কুন্‌ঠে পামু মাহাজন—কুন্‌ঠে পামু?"

"ওসব তুমি বুঝবে, আমার কি?"

"একটু একটু করা শোধ দিমু মাহাজন, মাফ্ করা দ্যান্"—

"না"—

"আপনার পায়োৎ পইড়ছি হামি—মাফ্ করা দ্যান্"—ভিখারীর মার লজ্জা উড়ে গেল, ঘোমটা সরিয়ে মিনতি জানাল সে, অসহায় বোধ করে কাঁপতে লাগল।

তালুকদার একইভাবে বলল, "মাফ্ টাফ্ করব না আমি ভিখারীর মা—হয় টাকা দাও, না তো জমি দাও তার বদলে"—

"জমি দিলে কি খামু মাহাজন?" ভিখারীর মার পায়ের নিচেকার মাটি যেন কেঁপে উঠল। জমি বিক্রি করে দেনা শোধ করবে! কিন্তু তারপর? ভবিষ্যৎ? ভিখারী, ন্যাড়া আর কাদু? সে ছাড়া কে ওদের মানুষ করবে? আর পাঁচ বিঘা পাঁচ কাঠা জমি ছাড়া কি আছে তার? জমি। মায়ের মত মমতাময়ী, প্রাণের মত দামী। সেই জমি বিক্রি করতে হবে?

মাথা নেড়ে সে উন্মাদের মত বলল, "না না, জমি দিবার পারমু না হামি"—

সুরেন তালুকদার একদৃষ্টে তাকাল ভিখারীর মার দিকে, তারপর হঠাৎ ভেজানো দরজার হুড়কোটা লাগিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

তার কালো মুখে ধারালো হাসি খেলে গেল, তার চোখের পিঙ্গল মণি দুটো জ্বলতে লাগল, চিবিয়ে চিবিয়ে সে বলল, "টাকা দেবার ক্ষমতা নেই, জমি দিতে মায়া হয়—সব বুঝলাম। কিন্তু আমি তো দাতাকর্ণ নই, একটা কিছু আমায় দিতেই হবে—আজই"—

দৈত্যের মত কালো ছায়া ফেলে অরণ্যচর বনমানুষের মত তালুকদার এগিয়ে এল। আর্তনাদ করতে গিয়েছিল ভিখারীর মা, কিন্তু তালুকদার তাকে বোঝাল যে তার ফল আরো মারাত্মক হবে। পৃথিবীতে সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র যে টাকা সেই টাকার অভাব যার নেই সে দিনকে রাত করতে পারে, ভিখারীর মার মত অভিশপ্ত মানুষদের জ্যান্ত কবর দিতে পারে। কেঁদেছিল ভিখারীর মা, তালুকদারের ক্ষমতার অনস্বীকার্য প্রভাব উপলব্ধি করে পায়ে পড়ে সসম্মানে বেঁচে থাকার প্রার্থনা জানিয়েছিল। আর ভেবেছিল—টাকা তার নেই সুতরাং একসঙ্গে দেনা শোধ করার কথা বাতুলতা। আর জমি? সে তো প্রাণ, সে তো জীবনের কোষাগার। সেই জমিই বা কি করে বেচে সে? অতএব? ছেলেমেয়েদের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়েছিল সে। ওদের বাঁচাতে হবে, বড় করতে হবে, তবেই ভিখারীর মার সংগ্রাম শেষ হবে। সেই সংগ্রামের মাঝে তালুকদারের লালসা একটা অস্ত্রের আঘাতের মত জ্বালাময় ক্ষত রচনা করবে। সতীত্ব ও নারীত্বের মর্যাদার চেয়েও ছেলেমেয়েরা অনেক বড়। না, সে জমি ছাড়তে পারবে না।

শীতের রাত। বাইরে কুয়াসা ঠাণ্ডা অন্ধকারের মাঝে জমাট হচ্ছে। শেয়াল ডাকছে কালীতলার ওদিকে। তন্দ্রাচ্ছন্ন গ্রাম। ভৌতিক মুহূর্ত।

আর এরই মাঝে একটা নরকের আগুনে স্নান করল ভিখারীর মা। আগুনে জ্বলে, পুড়ে, ঝল্‌সেও বাঁচতে চাইল, বাঁচাতে চাইল। তালুকদার চলে যাবার পর ঠায় বসে রইল সে, একটা নিশাচরী রাক্ষসীর মত অগ্নিময় দৃষ্টি মেলে শীতের রাতের প্রহর গুণতে লাগল—

চমক ভাঙ্গল, যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠল ভিখারীর মা। নরহরি ডাকছে।

"হাকিম এসেছে, বুঝেছ ভিখারীর মা—" নরহরি ব্যস্তভাবে ছুটে এল, "একটু বাদেই ডাক পড়বে। তা ঘোষ মশাই কোথায় ?"

ঠিক সেই সময়েই লোচন ঘোষ ফিরে এল, পেছনে মহাদেব।

নরহরি বলল, "এই যে এসেছেন, এখুনি ডাক পড়বে। আর হ্যাঁ, চার আনা পয়সা দিন, পেশ্‌কারকে দিতে হবে"—

"আচ্ছা বাবা"—লোচন ঘোষ মাথা নেড়ে একটা সিকি বের করে দিল।

নরহরি চলে গেল, আরো লোক আছে তার ওখানে, দাঁড়াবার সময় নেই।

মহাদেব লোচনের দিকে তাকাল। খুব খেয়ে এসেছে লোকটা, জামার ওপব থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে তার পেটটা ফুলে উঠেছে।

সে ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করল, "খায়া আইলেন মাহাজন ?"

"হুঁ"—

"কি খাইলেন ?"

লোচন ঘোষ খেয়ে এসে একটু ঠাণ্ডা মেজাজে আছে তাই চটল না, বলল, "তা খুব খারাপ খাই নাই রে। চালটা একটু মোটা ছিল, তবে স্বাদ খারাপ নয়। কাঁচা মুগের ডাল ছিল, আলু আর পটল ভাজা ছিল, চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি ছিল, রুই মাছের তরকারি ছিল আর ছিল একটা টক"—

শুনতে শুনতে মহাদেবের মুখটা আল্‌গা হয়ে গিয়েছিল, চোখ বড় হয়ে উঠেছিল, কল্পনায় সব খাবারগুলোকে দেখতে পেয়ে জিভে জল এসে পড়েছিল।

ঢোক গিলে সে বলল, "তা তো ভালই খাইলেন"—

লোচন ঘোষ মৃদু হাসল, "কিন্তু কান-মলা যে দাম নিল, বারো আনা"—

মহাদেব সমর্থনসূচক হাসি হেসে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল, আড়চোখে একবার লোচন ঘোষকে লক্ষ্য করল, তারপর হঠাৎ বলল, "মাহাজন"—

"কি ?"

"একটা বিড়ি ছ্যান্‌ গো"—

"কি ?" লোচন ঘোষের গায়ে যেন একটা ছুঁচোবাজি ছিট্‌কে পড়ল, শরীরের রক্ত তার মাথায় চড়ে গেল, দাঁত খিঁচিয়ে সে বলল, "বিড়ি! তুকে বিড়ি খাওয়াবার ভার কি ভগমান হামাক্‌ দিছেরে গাধা ? এ্যাঁ ?"

লোচন ঘোষের কণ্ঠের উত্তাপ যত ডিগ্রী চড়ল, মহাদেবের কণ্ঠেও ঠিক তত ডিগ্রী কোমলতা দেখা দিল, মাথা নিচু করে সে আবার অম্লান বদনে বলল, "ইবারটা দিয়া আর না দিলেন মাহাজন"—

কোর্টের ভেতর থেকে পিয়াদার হাঁক শোনা গেল—"মহেন্দ্রনাথ দাস, হাজির হো-ও ও-ও"—

কবালা রেজিস্ট্রির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।

লোচন ঘোষ অনেক ভেবে এবারও একটা বিড়ি দিল মহাদেবকে। ব্যস্‌, এই শেষবার।

বারান্দায় লোকজনের ভিড় বেড়ে গেছে। মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মুহুরি আর ক্রেতা বিক্রেতারা পেশ্‌কারদের চারিদিকে ভিড় করে আছে। ঘুষ দিচ্ছে। দুটো বেঞ্চ রয়েছে হাকিমের মুখোমুখি, লোকেরা

গাদাগাদি করে বসে আছে তাতে। মাঝখানে কাঠের রেলিং, তার পেছনে উঁচু বেদী, তার ওপর টেবিল, টেবিলের ওপাশে মস্ত বড় একটা চেয়ারে হাকিম সাহেব। তাঁর ডান পাশে একটা ঘূর্ণ্যমান আলমারিতে আইনের বই। পেছনের দেওয়ালে, বহুদিন আগে টাঙ্গানো সম্রাট পঞ্চম জর্জের একটা রঙীন ছবি। হাকিম সাহেবের বাঁ পাশে একটা টুলের সামনে পিয়াদা দাঁড়িয়ে আছে, হাঁক দিয়ে ডাকছে জমি-বিক্রেতাদের। ওদিকে মাথার উপরে দুলছে একটা টানাপাখা, টানছে একটা মুসলমান ছেলে, ঝিমোতে ঝিমোতে।

বিচিত্র একটা অনাত্মীয় পরিবেশ। আইনের নির্বিকার রাজ্য।

ভিখারীর মার কানের মধ্যে ঝাঁঝাঁ শব্দ হচ্ছে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের মত। সে ঘেমে উঠেছে।

মহাদেব তাকাল তার দিকে, মৃদুকণ্ঠে বলল, "অত চুপ করা আছিস্ ক্যান্ ভিখারীর মা?"

ভিখারীর মার নাকটা একটু ফুলে উঠল, স্তিমিত দৃষ্টিকে সামনের দিকে প্রসারিত করে সে বলল, "হয়, চুপ করা আছি"—

পিয়াদার ডাক শোনা গেল, "রামদয়াল ভকত, হাজির হো-ও-ও-ও"—

মুহুরিরা যেখানে দলিল তৈরিতে ব্যস্ত সেখানে একটা আমগাছের নিচে কিছু নধর দুর্বাঘাস ঘন হয়ে আছে। সবুজ, মসৃণ ও স্নিগ্ধশোভায় মণ্ডিত—কাঁচা ধানের মত। ভিখারীর মা কেঁপে উঠল। সাতটা তালগাছ যেখানে নিশ্চল প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে, তার দু'বিঘা পাঁচ কাঠা জমিতে, এখন হয়ত ধানের ওপর হাওয়ার ঢেউ খেলে যাচ্ছে, নিঃশ্বাসের মত শব্দ উঠছে। প্রাণের পসরা তুলে ধরেছে তার মায়ের মত মাটি। অথচ সেই মাটি আজ—! ডুবন্ত মানুষের মত সারা জীবনের ছবি দেখে ভিখারীর মা।

সেই মাটির জন্য রাতের ঘুম তার নরকের বিভীষিকা হয়ে উঠেছিল। চরম অপমান ও লাঞ্ছনা সয়েছিল সে তার জন্য। জীবনের আনন্দ ছিল না, আশা ছিল না, কিন্তু ছেলেমেয়েদের বিষয়ে দুর্বলতা ছিল। আর তাদের জন্য সে দেহমন বিষাক্ত করেও জমি বাঁচাল।

কিন্তু বাঁচল কৈ তা? একমাস, দু'মাস, তিনমাস কাটল। হঠাৎ একদিন সুরেন তালুকদার আবার টাকা চেয়ে বসল। আকাশ থেকে পড়ল ভিখারীর মা, অতর্কিতে যেন ছোরা বিঁধল তার পিঠে। তালুকদার বলল যে ভিখারীর মা বিশেষ কারণেই তিনমাস পর্যন্ত সময় পেয়েছে, কিন্তু আর নয়। চোখে অন্ধকার দেখল বেচারী। কয়েকজন সহানুভূতি-প্রবণ লোকের সাহায্যে ঋণসালিশী বোর্ডকে ব্যাপারটা জানানো হল। একটা রফা হল। মাসিক দশ টাকা কিস্তিতে দেনা শোধ করতে হবে। বাঁকা হেসে তালুকদার রাজী হল।

দশ টাকা কিস্তি। প্রতিমাসে দিতে হবে। কিন্তু কোত্থেকে আসবে সে টাকা? কে দেবে? এদিকে যে দিন চলে না। পারল না ভিখারীর মা। সর্বস্ব বলি দিয়েও সমস্ত জমিকে বাঁচাতে পারল না সে। তিন চার মাস কেটে গেলে তালুকদার মোকদ্দমা করবে বলে ভয় দেখাল, প্রস্তাব করল যে হাঙ্গামা এড়াতে হলে তিন বিঘে জমি বেচে ফেলুক ভিখারীর মা। ষাট টাকা করে প্রতি বিঘার দাম দেবে সে। দেনা শোধ করেও কিছু টাকা হাতে থাকবে ভিখারীর মার।

অন্যান্য ধনী গৃহস্থদের কাছে গেল ভিখারীর মা—যদি কেউ আরো বেশী দামে জমি কেনে। কিন্তু সুরেন তালুকদার যে জমি নিতে চায় তা বেশী দামে নেবার সাহস আর কারো হল না। গেল, শেষ পর্যন্ত তিন বিঘে মাখনের মত জমিকে বেচতে হল তালুকদারের কাছে। তালুকদার ভিখারীর মার ইজ্জৎ নিল, আবার দেহের একটা টুকরোও যেন কেটে নিল। টাকা শোধ করে বাড়ী ফিরে শক্ত মাটিতে মাথা খুঁড়ে রক্ত বের

করল ভিখারীর মা। ছেলেমেয়েরা তাকে ঘিরে কেঁদে খুন হল। তিন বিঘে জমি গেল, বাকী রইল দু'বিঘে পাঁচ কাঠা।

সেদিন থেকে অবস্থাটা দ্রুত পালটাতে লাগল। গৃহস্থের বৌ, তরি-তরকারি নিয়ে হাটে যেতে পারে না, অন্য কাজ করতে পারে না। এত বড় পৃথিবীতে বসিয়ে বসিয়ে ভাত খাওয়াবার মত কোনো পরমাত্মীয়কেও দেখা গেল না। গাঁয়ের কেউ এগিয়েও এল না সহানুভূতি জানাতে। একা, সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়ল ভিখারীর মা। জীবনকে দলে পিষে ধ্বংস করার জন্য যে সব অদৃশ্য শক্তিরা চক্রান্ত করছিল তাদের সঙ্গে সে একাই লড়াই করতে লাগল। কিন্তু কতদিন—কতদিন? দুর্দিনের অন্ধকার আরো জাঁকিয়ে এবার আকাল হয়ে এল, জানোয়ারের মত মানুষদের ঘাস-পাতা খেয়ে বাঁচবার কথা শোনা গেল। এল ব্যাধি, এল নগ্নতার লজ্জা। ছ'বছরের খাজনা বাকী পড়ল। আবার দেনা করতে হল। এর বাড়ীতে ওর বাড়ীতে ঢেঁকি কুটে, ধান ঝেড়ে, মুড়ি ভেজে আর কতটুকু সামাল দেওয়া যায় এই দুর্দিনে, যখন চড়া দামে সব কিছু আগুনের মত হয়ে উঠেছে?

এবার টাকা দিল লোচন ঘোষ। একবার নয়, চারবার। লোচন ঘোষ হুঁশিয়ার লোক, প্রতিবার টিপসইযুক্ত হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিল সে। একটু একটু করে জমি বন্ধক দিয়ে টাকা নিল ভিখারীর মা। শেষে সমস্ত জমিই বন্ধকি হয়ে দাঁড়াল, আর দেনা হল মোট একশ' পঁয়ষট্টি টাকা—চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ধরে। লোচন ঘোষ সুরেন তালুকদারের মত খারাপ লোক নয়। ছ'মাস সময় দিল সে। দেখতে দেখতে তা কেটে গেল। লোচন ঘোষ এক কথার মানুষ, আর সময় দিল না। এবার জমির দর উঠল দেড়শ' টাকা বিঘে, কিন্তু উপায় নেই, জমি তো বন্ধকি। লোচন ঘোষের পায়ে পড়ল ভিখারীর মা, বুক চাপড়ে কাঁদল। ফল হল না। নিষ্ঠুর, নির্বিকার না হলে কি কেউ জোতজমি করতে পারে? অতএব?

রঙ্গমঞ্চের শেষ দৃশ্য ঘনিয়ে এল—সে দৃশ্যের স্থান সাব-রেজিস্ট্রারের দপ্তরখানা।

"গঙ্গাকুমারী বর্মণ হাজির হো-ও-ও-ও"—পিয়াদার ডাক ভেসে এল।

চম্‌কে উঠল ভিখারীর মা। যেন প্রেতলোক থেকে ডাক এল, যেন ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার জন্য জল্লাদের হাঁক শোনা গেল।

লোচন ঘোষ লাফিয়ে উঠল, "চল্ চল্ ভিখারীর মা শিগ্‌গীর, ওঠ্‌রে মহাদেব ওঠ্"—

ভিখারীর মার মুখে তেলতেলে ঘাম। দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেলে যেমন বিহ্বল চোখে তাকায় মানুষেরা তেমনি ভাবে চারদিকে তাকাল সে, কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল।

কাঠগড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

রোগা, পাতলা, বুড়ো হাকিম নথিপত্তরের ওপর ঝুঁকে রয়েছেন। মুখে ক্লান্তি ও বিরক্তি, চোখে নিকেল ফ্রেমের চশমা। একবার মুখ তুলে তাকালেন তিনি, ভিখারীর মাকে এক ঝলক দেখেই আবার কাগজপত্তরের গাদায় দৃষ্টিটা নিবদ্ধ করলেন।

পিয়াদা ডাকল, "গঙ্গাকুমারী বর্মণ কৈ ?"

লোচন ঘোষ বলল, "হাজির আছে"—

"কে ?"

লোচন ঘোষ ভিখারীর মাকে দেখাল—"এই যে।"

পিয়াদা হাকিমের হয়ে মুখস্থ করা প্রশ্ন করল, "তুমিই গঙ্গাকুমারী বর্মণ ?"—

ভিখারীর মা ঘাড় নাড়ল, অস্ফুটকণ্ঠে বলল, "হাঁ"—

"তোমার স্বামীর নাম নিতাই বর্মণ ? গোমস্তাপুর থানার মেহেরপুর গাঁয়ে বাড়ী ?"

"হাঁ"

"তুমি জমি বেচবে ?"—

"হাঁ"—

"তোমাকে সনাক্ত করবে কে ?"

মহাদেব এগিয়ে গেল, সহাস্তে বলল, "আজ্ঞা হামি, মহাদেব দাস"—

"হুঁ, তোমার বাপের নাম ?"

"আজ্ঞা কানাই দাস।"

"তুমি গঙ্গাকুমারী বর্মণকে চেন ?"

"আজ্ঞা হাঁ"—

ভিখারীর মার দিকে ফিরে তাকাল পিয়াদা, জিজ্ঞেস করল, "সব টাকা পেয়েছ, জমির দাম ?"

লোচন ঘোষ কোমর থেকে ন্যাকড়ায় বাঁধা টাকা বের করে ভিখারীর মার হাতে দিল, বলল, "এই যে দিলাম"—

পিয়াদা বলল, "আচ্ছা এবার যাও।"

নরহরি এসে দাঁড়িয়েছিল পেছনে, ডেকে নিয়ে গেল কেরানীবাবুর কাছে।

একটা মোটা খাতায় টিপসই দিল ভিখারীর মা। বলির পশুর মত কাঁপতে কাঁপতে ভয়ার্ত চোখের দৃষ্টি মেলে, মাংসহীন লিক্‌লিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

ঘরের ভেতর তখন দেয়াল ঘড়িটা টিক্‌টিক্ করছে। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, পিয়াদার মুখস্থ করা প্রশ্ন ধ্বনিত হচ্ছে। পেশ্‌কারের তাড়া খেয়ে মুসলমান পাঙ্খাওয়ালাটা হঠাৎ সক্রোশে দড়ি ধরে টানছে। ডাইনীর ডানার মত বাতাসকে আঘাত করছে পাখাটা, শাঁশাঁ শব্দ হচ্ছে। আর চশমা পরিহিত হাকিম সাহেব ঝুঁকে আছে তার টেবিলের ওপর, নির্বিকার ব্রহ্মের মত।

সব শেষ। যবনিকা-পতন। করাত দিয়ে কে যেন ভিখারীর মার গলাটা কেটে ফেলেছে। বাইরে বেরোল ওরা।

লোচন ঘোষ বলল, "টাকাটা গুণা ছাখ্ ভিখারীর মা"—

ভিখারীর মা গুণল—যন্ত্রের মত। মহাদেবও গুণল।

"কত আছে ?"

"পঞ্চান্ন টাকা বারো আনা"—মহাদেব বলল।

"ঠিক"—লোচন ঘোষ মাথা ঝাঁকালো, "তবে হিসেব শোন্। একশো পয়ষট্টি টাকার দেনা, তুদের গাড়ীভাড়া বারো আনা, চিড়ের দাম চার আনা, আর তু'বছরের বাকী খাজনা তিন টাকা ছ'আনা—কত হইল ? একশো উনসত্তর টাকা ছ'আনা, কেমন ? বেশ। এখন তু'বিঘে পাঁচ কাঠা মাটির দাম হইল গিয়া তু'শো পঁচিশ টাকা—আমার পাওনা বাদ দিয়া তাই ঐ টাকা দিলাম। আমি খারাপ লোক লই ভিখারীর মা। কোর্টের কাগজের দাম, কোর্ট-ফি আর নরহরির টাকাটা আমিই দিলাম, যা কথা ছিল তা রাখলাম। লাও হে নরহরি, এই টাকাটা লাও"—

নরহরি দাস খুব খুশি হল না, "মাত্র এক টাকা ! কি যে বলেন ঘোষ মশাই !"

"আরে লাও লাও, আবার এমনি কতবার আসব দেখো, লাও"—নিঃশব্দে তাই নিল নরহরি। লোচন ঘোষের কথা যে মিথ্যে নয় তা সে জানে।

লোচন ঘোষ বলল, "আচ্ছা আমি তবে যাই, একটু কাজ আছে। তুরা স্টেশনে যা—আমি আসছি—আর ভিখারীর মা চারডা খায়া লিস্।"

ভিখারীর মা কথা বলল না। লোচন ঘোষ পা বাড়াল, মহাদেব বলল, "একটা বিড়ি দিয়া যান্ মাহাজন, এই খাবার।"

লোচন ঘোষ গাল দিল, "ব্যাটার কি একটুও লজ্জা থাক্‌তে নাইরে বাবা আঁ ? লে, লে হতভাগা, খায়া মর্"—

একটা বিড়ি দিয়ে দ্রুতপদে চলে গেল লোচন ঘোষ। খুব বেশী চটল না এবার। জমি পেয়ে মনটা খুশি হয়ে গেছে তার। মাখনের মত নরম জমি, সোনার মত ধান ফলে তাতে। খুব সস্তাতেই তা পেয়ে গেল সে—শুধু তাই নয়, জমির ওপর যে ধান ফলেছে এবার তাও সে ভোগ করতে পারবে। সুতরাং সে খুশি হবে না কেন ?

* * *

মহাদেব বলল, "চল্ ভিখারীর মা—চাট্টি খায়া লে, শরীর পাত করিস্ না"—

ভিখারীর মা নিরুত্তরে হাঁটতে লাগল—খোঁড়া কুকুরের মত, মুমূর্ষুর মত, যন্ত্রের মত।

"ভাত খাবু ভিখারীর মা—ভাত ? জমি বিচ্‌লি, এ্যাখন তো পাইসা আছে সাথে"—মহাদেব বলল।

পশ্চিমা বামুনের টিনের ঘর। তার গায়ে আল্‌কাৎরা দিয়ে লেখা আছে—'বিশুদ্ধ ব্রাহ্‌মণের হোটেল—আসুন'।

ভাত ! নড়ে উঠল ভিখারীর মা। ভাত ! কাল থেকে আজ পর্যন্ত পেটে ভাত যায়নি। যা ছিল তা সব ছেলেমেয়েদের জন্য রেখে এসেছে সে।

"খাবু ?" মহাদেব প্রশ্ন করল নরম গলায়।

"তুমি খাবা না ?" ভিখারীর মা শুক্‌নো গলায় পাল্‌টা প্রশ্ন করল।

"হামি তো চিড়া খাইয়াছি"—মহাদেব দুর্বলকণ্ঠে বলল। এমন ভঙ্গিতে বলল যার অর্থ এই যে খেলে মন্দ হয় না।

"না না, তুমিও খাও দুডা—হামার জন্য কত দুঃখ পালা"—টেনে টেনে বলল ভিখারীর মা।

ভেতরে গেল ওরা। পশ্চিমা বামুন কলরব করে অভ্যর্থনা জানাল। মোটা চালের ভাত, আলুভাজা আর অড়হর ডাল এনে দিল।

বাইরে তখন বেলা পড়ে এসেছে। দুপুর অতিক্রান্ত, শান্ত প্রকৃতি। কিন্তু ভিখারীর মার কাছে পৃথিবীর সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ তখন অর্থহীন।

খুশিমনে ভাতে হাত দিল মহাদেব। চিড়ে আর ভাত, কাঁচা আর পাকা ফলার—দুই-ই জুটল তার। আর বাড়ী থেকে নিয়ে আসা চার আনা পয়সাও অটুট আছে। আঃ!

কিন্তু ভিখারীর মা খাচ্ছে না। চুপ করে ভাবছে। কোমরে পঞ্চান্ন টাকা বারো আনা ঠিকই আছে। কিন্তু তাতে কি হবে? ক'দিন চলবে? গৃহস্থের বৌ, হাটে যেতে পারেনি, কুলিমেয়েদের মত খাটতে পারেনি। কিন্তু এই টাকা ফুরোলে কি হবে? ভিখারী, ন্যাড়া, কাদু—ওদের তো বাঁচাতেই হবে। না, উপায় নেই। অনেকদিন আগেই তো ইজ্জৎ গেছে, এবার হাটে গেলেই বা কি, মজুরণী হলেই বা কি? তাছাড়া আর উপায়ও নেই। আরো নিচে নামতে হবে। তবু হার মানবে না ভিখারীর মা—ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রাখবেই সে। কিন্তু মরা মানুষ কি করে সন্তানদের বাঁচাবে! মরা না তো কি! ভিখারীর মা তো মরে গেল আজ। কারণ, জমিই ছিল তার প্রাণ। সেই জমি আজ থেকে আর তার নয়। কে যেন একটা অদৃশ্য করাত দিয়ে ভিখারীর মার গলা কেটে ফেলেছে। জ্বলে যাচ্ছে বুক, চোখ; কানের ভেতর ঝিঁঝিঁ ডাকছে, মাথায় রক্ত চড়ছে, সব কিছু অন্ধকার হয়ে আসছে।

এতদিন ছিল, আজ আর তার জমি নেই। সপ্তরথীর মত সাতটা তালগাছ যেখানে মাথা তুলে আছে সেখানেই সেই জমি। শরতের আকাশের নিচে বিস্তৃত হয়ে আছে সতেজ, সবুজ বরণের চারগুলো, তার ওপর হাওয়ায় দুলছে, নিঃশ্বাস ফেলছে। তাদের মাঝে চড়ুই, শালিক, ময়নারা কিচিরমিচির করে উড়ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিন কাটবে, সে ধান পেকে সোনা হবে। এমনি বছরের পর বছর কাটবে। অকৃপণ স্নেহের ভাণ্ডার খুলে সেই মায়ের মত মমতাময়ী মাটি চিরকাল প্রাণের পসরা মেলে

ধরবে। কিন্তু তাতে ভিখারীর মার কোন লাভ নেই। জমি তো এখন লোচন ঘোষের। কিন্তু কোনোদিন যদি সে নির্জন মুহূর্তে, সন্ধ্যার অন্ধকারে ওখানে গিয়ে দাঁড়ায়! তাহলে—তাহলে সেই ক'বিঘে মাটি কি তাকে চিনবে না, সম্ভাষণ জানাবে না?

মহাদেব খাওয়া থামাল, অবাক হয়ে বলল, "খাছিস্ না যে—খা ভিখারীর মা"—

ভিখারীর মা মাথা নাড়ল, ভাতে হাত দিয়ে এক গ্রাস মুখে তুলল, চিবোতে আরম্ভ করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিষম খেল সে, তার মুখের ভাত ছিট্‌কে পড়ল সামনে, থুথু করে ফেলে দিল সে বাকী ভাত, ফেলে কাঁদতে লাগল।

"কি হইল তুর ভিখারীর মা—অ্যাঁ?" মহাদেব রীতিমত ঘাব্‌ড়ে গেল।

হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল ভিখারীর মা, হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বাঁধানো মেঝের ওপর মাথা ঠুকতে লাগল, পশুর মত আর্ত কণ্ঠে বলল, "হামার খুন খাছি গো হামি—হামার খুন"—

———

ইস্পাত

শ্রীমন্ত সা' বাড়ী ফিরছিল। গিয়েছিল আটমাইল দূরে, প্রাচীন গৌড়ের কাছাকাছি, জোতজমির তদারক করতে। ধানকাটার দিন এসেছে, অতদূর পথ, হেঁটে যাওয়ার মত হাল্‌কা শরীর নয় তার। অনেক জমিজমার মালিক, মহাজন ও গোলদার শ্রীমন্ত সা'র চল্লিশ বছরের শরীর তার পার্থিব বৈভবের মতই বেশ শাঁসালো ও ভারী। হেঁটে নয়, কালো রঙের একটা টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে সে বাড়ী ফিরছিল।

ফসল খুব ভাল হয়েছে। শ্রীমন্ত সা'র মনে স্ফূর্ত্তির জোয়ার এসেছে। অনেক ধান। মানে দুর্দ্দিনের বাজারে বেশ চড়া দাম, মোটা মুনাফা। ঘোড়ার খুরের আঘাতে কাঁচা সড়কের ধূলো উড়িয়ে, রায়-পুকুরের পাশ দিয়ে সে বাড়ী ফিরছিল। হাতে একটা সিগারেট জ্বলছিল তার। আজকাল সে খুব সিগারেট খায়, আজকাল মানে তেরশ'পঞ্চাশ থেকে।

পুকুরের পাশ দিয়ে ঘুরে রায়দের মস্ত বড় আমকাঁঠালের বাগানের মাঝখান দিয়ে সড়কটা চলে গেছে। বহুদিনের পুরোনো বাগান, ঝোপঝাড়, লতাপাতায় ও নানা আগাছায় ভরপুর ও অন্ধকার। রায়দের প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আর একটা ভাঙ্গা ঘাটওয়ালা ও পানায়-ভর্ত্তি মজা পুকুরের পাশ দিয়ে রাস্তাটা বাগানটা পার হয়ে গাঁয়ের ভেতরে চলে গেছে।

বাগানের মধ্যে পড়তেই একটা ব্যাপার ঘটলো। বিদ্যুতের আগুনে যেন শ্রীমন্ত সা'র চোখ ঝল্‌সে গেল, তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠল। টাট্টু ঘোড়ার উপর থেকে মাতালের মত পড়তে পড়তে শ্রীমন্ত সা' নিজেকে সাম্‌লে নিল। বহু মানুষের সর্ব্বনাশ করে আর তাদের রক্ত চুষে চুষে জোঁকের মত যে রক্ত সে সঞ্চয় করেছে, আজ সেই রক্তের মধ্যে এক মুহূর্ত্তে এক প্রচণ্ড আলোড়ন উপস্থিত হল।

ঘনপত্র-সমাকুল গাছপালার তলা দিয়ে কলসী-কাঁখে একটি যুবতী যাচ্ছিল। বিবাহিতা যুবতী, সিঁদুরের আভায় তার ললাটদেশ আরক্তিম। পরিধানে ছিন্ন শাড়ী, দেখলেই বোঝা যায় সে গরীব ঘরের মেয়ে।

নারীমাংস-লোলুপ শ্রীমন্ত সা'র মনে বৈপ্লবিক চেতনা জাগল—যে চেতনার ফলে মানুষ প্রাণ দিতেও রাজী হয়। যুবতীটি অপূর্ব্ব সুন্দরী। যেন বিদ্যুৎ-লতা।

টাট্টু ঘোড়ার পায়ের গতি মন্থর হল।

যুবতীটি একবার পেছন ফিরে তাকিয়েই চলার গতি বাড়িয়ে দিল।

শিকারী বাজপাখীর চোখের মত ধারালো, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে শ্রীমন্তর চোখ। এদিক ওদিক একবার দেখে নিল সে। আশেপাশে কেউ নেই।

শ্রীমন্ত একটু কাশল।

যুবতীটির কাঁখের পূর্ণকুম্ভ থেকে শব্দ উঠছে।

"শোন"—শ্রীমন্ত ডাকল।

যুবতীটি থামল না।

টাট্টু ঘোড়ার পেটে জুতোর গোড়ালি দিয়ে একটা গুঁতো মেরে তার গতি বাড়িয়ে দিয়ে যুবতীটির পাশে গিয়ে শ্রীমন্ত হাজির হল।

"ওগো বাছা—শোন—"

যুবতীটি থামল, শ্রীমন্তের দিকে তাকিয়ে ঘোম্‌টাটা একটু বাড়িয়ে দিল।

শ্রীমন্ত ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামল। হঠাৎ যেন বয়স পেছিয়ে গেছে তার, তাই অমন ভারী চেহারা নিয়েও শ্রীমন্ত সা' লাফ দিয়ে নামল, ধপ্ করে একটা শব্দ হল, তার ভুঁড়িটা একটু দুলেও উঠল।

হেসে বলল সে, "আহা-হা, লজ্জা কেন? আমি ত' ছেলেছোক্‌রা নই আর বাঘ-ভালুকও নই।"

"কি চান আপনি?" মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন হল।

"তোমাদের বাড়ী কোথায় গা?"

"এই গাঁয়েই—"

"এই গাঁয়ে! অথচ আমি জানি না, দেখিওনি ?"

"কম্মকারের বৌ আমি, এই বাগানের শেষে আমাদের বাড়ী।"

"বটে! বেশ-বেশ—কোন্ কম্মকারের বৌ তুমি ?"

যুবতীটি উত্তর না দিয়ে চলতে লাগল।

শ্রীমন্ত জিভ কেটে হেসে বলল, "ভুল হয়েছে। ঠিক ঠিক, সোয়ামীর নাম তো মেয়েরা বলে না—তাইত—"

টাট্টু ঘোড়ার পায়ের নীচে শুকনো পাতা খস্‌খস্ করছে, তার লাগাম ধরে যুবতীটির পেছন পেছন যাচ্ছে শ্রীমন্ত সা'। যুবতীটির সুগঠিত দেহের প্রতিটি রেখা যা তার গমন-ভঙ্গীর ফলে আরও আকর্ষণীয় ও লোভনীয় হয়ে উঠেছে—তারই দিকে নির্নিমেষ চক্ষু দু'টি নিবদ্ধ করে ক্ষুধার্ত্ত অজগরের মত এগোচ্ছে শ্রীমন্ত সা'।

"তোমার নাম কি বাছা ?" সে শুধোল।

যুবতীটি উত্তর দিল না।

"লজ্জা কি, বলই না, নাম জেনে কি খেয়ে ফেলব ?" শ্রীমন্ত হাসল।

"নাম জেনে আপনার লাভ ?" ঘোম্‌টার ভেতর থেকে তীরের মত এলো প্রশ্নটা।

"এম্‌নি—কৌতূহল। চিনি না, তাই শুধোচ্ছি, নাম জানলে হয়ত চিনতে পারব।"

যুবতীটি চলার বেগ আরো একটু বাড়িয়ে বলল, "আমার নাম চাঁপা।"

শ্রীমন্ত নাম শুনে দু'তিনবার তা উচ্চারণ করল নিজের মনে, "চাঁপা—চাঁপা—হুঁ"—, পরে যুবতীটির দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল, "নাম তোমার সার্থক হয়েছে।"

"কেন ?" ভ্রূকুঞ্চিত করে যুবতীটি প্রশ্ন করল। একটু কৌতূহল মেশানো তার কণ্ঠের রূঢ়তায়।

"কেন ?" শ্রীমন্তের চোখের তারা দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো উত্তর দিতে গিয়ে, "কেন কিগো ? আয়নাতে কি নিজের মুখটি দেখনি কোনদিন ? নাম তোমার সার্থক হয়েছে, শুধু চাঁপা নও, কনকচাঁপা তুমি। কিন্তু নাম জেনেও তো চিনতে পারলাম না তোমাদের বাছা। যাক্, যাবার পথে তোমাদের বাড়ীটা দেখলেই চিনতে পারব।"

চাঁপার সারাদেহ এবার থরথর করে কেঁপে উঠল। রূপ যার থাকে সে মানুষও চেনে সহজে। আরো তাড়াতাড়ি চলতে লাগল সে। ভরা কলসী থেকে জল যেমন উপচে পড়তে চাইছে, চাঁপার হৃৎপিণ্ডটাও তেমনি বেরিয়ে আসতে চাইছে ভয়ে, আশঙ্কায়।

পলায়নপরা হরিণীর পেছনে যেমন শিকারী ছোটে আসন্ন মৃগয়ার উল্লাসে তেমনিভাবে এগোচ্ছে শ্রীমন্ত সা' চাঁপার পেছনে পেছনে, তার টাট্টুর লাগাম ধরে ধরে।

বাগানের শেষ প্রান্তের প্রথম বাড়ীটাতে চাঁপা অন্তর্হিত হল।

বাড়ীটার চেহারা দেখে খুসী হল শ্রীমন্ত। খড়ের চালটা সামনের বর্ষাতে ভেঙে পড়বেই। অর্থাৎ ঘোর দারিদ্র্য। শ্রীমন্তের অভীষ্ট সিদ্ধির পথে সহায় হবে এই দারিদ্র্য।

বাড়ীটার সামনের দিকের দাওয়া থেকে হাতুড়ীর আওয়াজ ভেসে আসছে। সেখানে গিয়ে হাজির হল শ্রীমন্ত। সে চিনতে পেরেছে। কৈলাস কর্ম্মকারের বাড়ী এটা। লোকটা চার পাঁচ বছর হল মারা গিয়েছে। চাঁপা বোধ হয় তার ছেলের বৌ।

কালো চেহারার একজন জোয়ান লোক দাওয়ায় বসে একটা অগ্নিদগ্ধ কাস্তেকে হাতুড়ী দিয়ে পিটছিল। আঘাতের ফলে রক্তবর্ণ সূক্ষ্ম লৌহচূর্ণ অগ্নিকণার মত চারিদিকে ছিটকে পড়ছে।

শ্রীমন্ত ডাকল, "ওহে কম্মকার—"

লোকটি তাকাল, শ্রীমন্তকে দেখে তার চোখের তারায় মুহূর্ত্তে সম্ভ্রম ঘনিয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আসুন, বসুন সাউমশাই।"

শ্রীমন্ত মাথা নাড়ল, "না হে সময় নেই। কৈলাস কর্ম্মকারের তুমি কে হও বলত ?"

"আমি তাঁর ছেলে।"

"ওঃ—তোমার নামটা যেন কি-কি—"

"ইন্দ্র।"

"ঠিক, ঠিক। তোমার নামটা জানতাম, তবে বেশী দেখাশোনা নেই ত', তাই মনে ছিল না। তোমার বাপের সঙ্গে আমার খুব আলাপ ছিল হে, খুব খাতির করত আমায়—"

"আজ্ঞে—"

"বিয়ে থা করেছ নিশ্চয়ই ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—পাঁচ বছর হলো।"

"ছেলেপিলে নেই ?"

ইন্দ্র কর্ম্মকার সলজ্জে বলল—"আজ্ঞে হয়নি।"

শ্রীমন্ত জিভ দিয়ে তালু স্পর্শ করে চুক্‌চুক্ শব্দ করে বলল, "আহা-হা, সবই ভগবানের ইচ্ছে। তা কাজকর্ম্ম চলছে কি রকম ?"

ইন্দ্রের চোখে মুখে অন্ধকার নেমে এলো, "কাজকম্মো আর কৈ—দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে। জাতব্যবসা ছেড়ে হয়ত আর কিছু করতে হবে কয়েকদিনের মধ্যে।"

শ্রীমন্ত এক মুহূর্ত্তকাল কি যেন ভাবল, পরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রকে একবার পর্য্যবেক্ষণ করে বলল, "কাজ করবে তুমি আমার কাছে ?"

"কি কাজ ?" ইন্দ্রের আগ্রহ আছে বোঝা গেল।

"আমি একটা পুকুর কাটাচ্ছি আমার বাড়ীর পেছনে। লোকজন খাটবে, দেখাশোনা করবে তুমি—রোজ এক টাকা করে পাবে।"

ইন্দ্রের চোখের তারা দু'টো নতুন রূপোর টাকার মত ঝক্‌ঝক্ করে উঠল, "কবে যেতে হবে ?"

"কাল সকালে এসো আমার কাছে। তোমার বাবাকে চিনতাম আমি—লোক ভাল ছিল সে। তার ছেলের দিন খারাপ যাচ্ছে, আমি কি সাহায্য না করে পারি ?"

ইন্দ্র মাথা নাড়ল, "আপনার উপকার ভুলব না, কাল যাব আমি।"

"এসো। আমি এখন চল্লাম।"

"বসবেন না ?"

শ্রীমন্ত রহস্যময় হাসি হাসল, "সে পরে হবে ইন্দ্র—পরে হয়ত তোমার এখানে দিনরাতই বসে থাকব।"

টাট্টু ঘোড়ার খুরের আঘাতে ধূলো উড়িয়ে শ্রীমন্ত সা' পথের বাঁকে, নিমগাছগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হল।

ইন্দ্র আবার কাস্তেটা তুলে নিল। আরো দু'তিনটে আঘাতেই ওর কাজ শেষ হবে।

ঠন্‌ঠন্ শব্দ উত্থিত হয়।

ইন্দ্রের হাতের, কাঁধের ও পিঠের মাংসপেশীগুলি ফুলে ফুলে ওঠে। ইন্দ্র নিজের দেহের দিকে তাকাল। তার শালগাছের মত দীর্ঘ ও সুগঠিত দেহে ভাঙ্গন ধরেছে। ইন্দ্র হাসল।

হয়ে গেছে। কাস্তেটা একপাশে রেখে দিয়ে আগুন নেভাতে লাগল ইন্দ্র। হাতে আর কাজ নেই।

"ওগো"—চাঁপা এসে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াল।

"জল নিয়ে এসেছ ?" ইন্দ্র হেসে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ।"

"জয়া ফেরেনি ?"

জয়া ইন্দ্রের ছোট বোন, বিধবা। স্বামীগৃহে তার অন্ন জোটেনি তাই ভাইয়ের আশ্রয়েই থাকে সে।

"না"—চাঁপা মাথা নড়ল, "আচ্ছা, তোমার কাছে কে এসেছিল গো—এই একটু আগে ?"

"শ্রীমন্ত সা'। নাম শোননি ?" ইন্দ্র হাসল, "সুদখোর মহাজন, বড়লোক, পাষণ্ড ?"

চাঁপার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এলো শ্রীমন্তের নাম শুনে। তার নাম সে শুনেছে বৈকি। বহু নারীর বেদনা, অশ্রু, অভিশাপকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে যে নিজের জীবনকে গড়ে তুলেছে—তাকে এই গাঁয়ের কে-না চেনে, তার লালসা, তার সর্প-ক্রূর চরিত্রের খবর কে-না জানে ?

"লোকটা বিয়ে করে না কেন বলত ?" চাঁপা ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল।

ইন্দ্র হেসে বলল, "তিনটে বিয়ে করেছে অথচ একটাও বেঁচে নেই। লোকে বলে 'বৌ-খেকো', তাই আর কেউ বিয়ে দিতে রাজী হয় না। আসল কথা কিন্তু তা নয়, বিয়ে করার দরকার পড়ে না লোকটার। ছেলেমেয়ে নেই, অগাধ টাকা-পয়সা, এই করেই টাকা ওড়াচ্ছে। সে যাক্ স্বার্থ দিয়েই কথা—লোকটা আমায় কাজ দিয়েছে, কাল থেকে মজুর খাটাতে যাব।"

"নিজের কাজ ছাড়লে ?" চাঁপার চোখ দু'টো যেন জ্বলে উঠল একবার।

"নিজের কাজে পয়সা আসে কৈ ? আর কাজই বা কৈ ?"

"বেশ তবে যেয়ো।"

দ্রুতপদে চাঁপা ভেতরে চলে গেল।

বেলা পড়ে এসেছে, রৌদ্রের তেজ ক্রমশঃ সোনালী হয়ে উঠছে, সামনের নিমগাছগুলোর ছায়া তার বাড়ীর দাওয়ার ওপর ঘন হয়ে এসে পড়েছে। দু'একটা পায়রার ডাক ভেসে আসে বাড়ীর পেছন থেকে।

"কই হে কর্মকার—হলো ?" জয়নুদ্দিন মণ্ডল এসে তার কাস্তে চাইল।

"এই নাও।"

জয়নুদ্দিন ভাল করে কাস্তেটা পরখ করল, পরে ট্যাঁক থেকে একটা সিকি বের করে ইন্দ্রের সামনে ফেলে দিল।

ইন্দ্র তা দেখে মাথা নাড়ল, "আর এক সিকি ?"

"হবে হবে, উতেই হবে—ইঃ, ভারী তো কাজ।"

"তবে নিজে করলেই পারতে—ছাও ছাও—"

জয়নুদ্দিন ক্ষণকাল চুপ করে রইল, পরে অন্যদিকের ট্যাঁক থেকে একটি দুয়ানি বের করে দিল।

"আর দু'আনা ?"

জয়নুদ্দিন হেসে উঠে দাঁড়াল, "চল্লাম ইন্দির।"

"বাঃ রে, পয়সা ? চল্‌লে ? বাকী রইল কিন্তু দু'আনা।"

"বাকী নয়, মিটে গেল।"

জয়নুদ্দিন চলে গেল।

দু'আনা পয়সার দিকে ইন্দ্র তাকিয়ে রইল। আভিজাত্য গিয়েছে তার। জীবনে সে লোহার কাজ ছাড়া আজ পর্য্যন্ত অন্য কিছু করেনি। কিন্তু এখন থেকে সব কিছুই করতে হবে তাকে। জাতব্যবসা ছাড়তে হবে। দুর্ভিক্ষের দিন এখনো শেষ হয়নি।

ইন্দ্র কর্মকার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

পরদিন সকালে ইন্দ্র শ্রীমন্ত সা'র ওখানে গেল। দুপুরে ফিরে এসে খেয়েই আবার বেরিয়ে গেল।

দুপুরবেলা জয়া বলল, "বৌদি, রামায়ণ শুনতে যাবি ?"

"কোথায় ?"

"বিম্‌লিদের বাড়ী—ওর মা বেশ পড়ে ভাই।"

"বাড়ীতে থাকবে কে? নারে, তুই যা, আমি যাব না।"

"আচ্ছা।"

জয়া বিম্‌লিদের ওখানে চলে গেল।

ঘরের মেঝেতে একটা ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে চাঁপা দেহ এলিয়ে দিল। মধ্যাহ্নের নির্জ্জনতায় একটা সুনিবিড় স্তব্ধতা, আসন্ন শীতের মৃদু রেশ হাল্কা হাওয়ায়। সূর্য্যালোক ক্রমশঃ রং বদ্‌লাচ্ছে। চাঁপার তন্দ্রা আসে।

এমন সময় কে যেন ডাকল উঠোনে এসে।

"কামার-বৌ আছ? ওগো বাছা, শুনছ?"

চাঁপা ধড়মড় করে উঠে বসল, "কে?"

একজন বুড়ী দাওয়ার উপর উঠে বসল, "আমি গো—"

দুর্গা নাপ্‌তেনী। সরীসৃপের মত কুটিল, অজস্র বলিরেখা-সম্বলিত মুখে তার একটা হিংস্রতার ছাপ। দেখে ভয় লাগে।

"কি দরকার ঠান্‌দি?"

বুড়ী হাসল, "দরকার ছাড়া কি আসতে নেই বৌ? যাচ্ছিনু বাড়ীর পাশ দিয়ে। ভাবনু একবার দেখেই যাই, ক'দিন আসি না—"

"বেশ ত', বোস।"

"ইন্দির নাই বাড়ী?"

"না, মজুর খাটাতে গেছে।"

"কোথায়?"

"সাউমশাই পুকুর কাটাচ্ছে—সেখানে।"

"তা ভাল, তা ভাল। দুর্দ্দিনে কি শুধু জাতব্যবসাতে চলে? তা বেশ, সাউয়ের নজরে পড়েছ তোমরা—একটা গতি হয়ে যাবে। বড় ভাল লোক গো, কি বুলব তোমায়, লোকে ওর নিন্দে করে, কিন্তু হ্যাগা, পুরুষমানুষের অমন দোষ কি থাকে না?"

"তা ত' বটেই—" চাঁপা কিছু বলার মত খুঁজে পায় না।

"আজকেই দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে—তোমাদের কথা বল্লে—"

"কি বল্লে ?"

বুড়ী ফিক্ করে একটু হেসে, স্বর নামিয়ে চারদিকে এক ঝলক নজর বুলিয়ে বলল, "বলব ?"

"বল"—চাঁপা যেন এতক্ষণে আঁচ করতে পারছে যে বুড়ী কেন এসেছে। বুড়ীর সুনামের কথা মনে পড়ল তার।

"বল্লে তোমাদের একটা হিল্লে করে দেবে সে—তবে একটু সেবাযত্নের আশা রাখে তোমার কাছে।" 'তোমার' কথাটার ওপর জোর দিয়ে বুড়ী একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসল।

"কি রকম ?" চাঁপার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠল।

"অত আমি জানি না বাছা, তবে সেবাযত্ন পেলে টাকা-পয়সা, গয়না-গাটিতে মুড়ে দেয় তেমন লোককে—ওপাড়ার নিতাইয়ের বৌয়ের কথা জাননা ? সেই যে গো—"

"ঠান্‌দি"—একটা সাপ যেন ফোঁস করে উঠল।

"কি বাছা ?" বুড়ী থতমত খেয়ে চাঁপার ভঙ্গী দেখে থামল।

"আমি বুঝেছি সব। এখন তুমি ওঠ দেখি—উঠে বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে—"

বুড়ী কথা শুনল, উঠে দাঁড়াল, তবু বলল, "আমার দোষ নেই—আমি ত' ভাল কথাই বলছিলাম"—

"সে আমি জানি, এখন বেরোও দেখি।"

"কিন্তু আমার কথা যে সাউ বিশ্বাস করবে না—তাকে কি বলব ?"

"বিশ্বাস করবে না ?" চাঁপা একটু ভাবল, ভেবে ডানহাত থেকে একটা শাঁখা খুলে নিয়ে তাতে একটু ললাটের সিঁদুর লাগিয়ে বুড়ীর হাতে দিয়ে বলল, "বলো যে আমি সাউয়ের মেয়ে, আমার এই শাঁখা আর সিঁদুরের মান যেন সে রাখে।"

বুড়ী চলে গেল।

চাঁপা বসে পড়ল।

জয়া ফিরে এসে সব কথা শুনল।

সে বলল, "দাদাকে আজ সব কথা বলে দে—সব—লুকোস্‌নে কিন্তু, বুঝলি?"

রাত্রে নিবিড়ভাবে চাঁপাকে বুকে টেনে নিয়ে ইন্দ্র বলল, "বেশ লাভের কাজ গো, এমনি এক টাকা করে রোজ, তাছাড়া মজুরদের কাছ থেকে দু'পয়সা করে সেলামী আছে।"

চাঁপা উত্তর দিল না। শিয়রের জানালা দিয়ে প্রতিপদের চাঁদের আলো ঘরের ভেতর এসে তাদের ওপর, তাদের বিছানার ওপর পড়েছে। সেই আলোতে ইন্দ্র দেখল যে চাঁপা চোখ বুজে আছে।

"কি হল বৌ—কথা শুনছিস্‌ না যে?"

"শুনবে কি হয়েছে?" চাঁপা চোখ মেলল।

"বল্‌।"

"শ্রীমন্ত সা'র নজর পড়েছে আমার ওপর।"

ইন্দ্রের মাংসপেশীগুলি কঠিন হয়ে উঠল, "কি করে বুঝলি?"

চাঁপা সব কথা বলতে চেয়েও বলতে পারল না। নারীজনোচিত অহেতুক লজ্জা ও ভয় কোত্থেকে যেন সুবিপুল বন্যার মত এসে তাকে আক্রমণ করল।

সে শুধু বলল, "দূতী পাঠিয়েছিল—দুগ্‌গা নাপ্‌তেনীকে—"

ইন্দ্র ক্ষণকাল চুপ করে রইল। এমন চুপ যে তার নিঃশ্বাসের শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না।

তারপর সে উঠে বসল। উঠে দু'হাতে চাঁপার মুখটা নিজের দিকে ফেরাল। সে নূতন করে দেখল চাঁপা রূপসী। চাঁদের মদির আলোয়

স্পর্শে চাঁপার মাদকতাময় সৌন্দর্য্য যেন আরও উগ্র, আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। সুবর্ণের মিশ্রণে অধিকতর উত্তেজক, উগ্র রসায়নের মত। আজ ইন্দ্র সর্ব্বপ্রথম বুঝল যে চাঁপা শুধু রূপসী নয়, অপূর্ব্ব রূপসী। শ্রীমন্ত সা' কোন্ ছার। শ্রীমন্ত সা'র মনোবৃত্তিসম্পন্ন কোনও রাজার দৃষ্টিও যদি আজ এই ইন্দ্র কর্ম্মকারের বৌয়ের ওপর পড়ে তবে তার রাজ্য ভস্মরেণুতে রূপান্তরিত করতেও সে হয়ত নিঃসঙ্কোচে রাজী হবে। চাঁপা রূপসী। অমাবস্যার অন্ধকারের মত কালো মেঘে ঢাকা আকাশের কোলে মাঝে মাঝে যে বিদ্যুৎ সাপের মত এঁকে বেঁকে দাগ কেটে যায় তারি মত দ্যুতিময়ী সে।

চাঁপাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ইন্দ্র কর্ম্মকার অভয় দিল, "বুঝেছি সব, বুঝেছি কেন শ্রীমন্ত সা'র এত দয়া, কিন্তু ভয় নেই বৌ—আমি আছি। আবার যদি সাউ তোর পেছনে লাগে—তবে তাকে আর বেঁচে থাকতে হবে না।"

চাঁপা শিউরে উঠল।

পরদিন থেকে মজুর খাটাতে যাওয়া বন্ধ করল ইন্দ্র।

কাজ তো বন্ধ হল। জীবিকা আসবে কিসে?

ইন্দ্র শহরে গেল। কিন্তু শহরে গেলেই বা কি? ইন্দ্র কর্ম্মকারকে চেনে কে?

পরদিন সে মাধবপুরের হাটে গেল দু'তিনটে পুরোনো কাস্তে আর দা নিয়ে। বিক্রী হল না। আরো অনেক কামার ভীড় করে ছিল সেখানে।

গ্রামেতে জনমজুর খাটবার কাজও আপাতত নেই। গ্রামের মধ্যে অত কাজ কোথায়?

সেদিন রাতে অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় কাটল সকলের।

ক্লান্তিতে চাঁপা কখন ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু ইন্দ্র জেগে রইল। ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকের মধ্যে দেখা গেল যে শালগাছের মত কালো শরীরটা নিয়ে ইন্দ্র কর্ম্মকার এদিক ওদিক পায়চারী করে বেড়াচ্ছে।

ভোরবেলায় বাইরের দাওয়ায় বসে ইন্দ্র ভাবছিল কি করবে সে। বাড়ীতে আহার্য্য নেই কিন্তু ক্ষুধা আছে। চাঁপা আর জয়া হয়ত ধার করে চালাবে এবেলা কিন্তু তারপর? ঠিক, পাশের গাঁয়ে গিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে আসতে হবে।

চাঁপা কলসী কাঁখে জল আনতে বেরোল।

"বেরোবে নাকি কোথাও?" যাবার আগে সে শুধোল।

"না গেলে চলবে কি করে?" ক্লিষ্ট হাসি হাসল ইন্দ্র।

ইন্দ্রের দিকে তাকিয়ে তার চিন্তামলিন মুখ দেখে চাঁপার বক্ষ মথিত করে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। আর কিছু না বলে সে চলে গেল।

ইন্দ্র উঠে দাঁড়াল। জামাটা গায়ে দিয়েই সে বেরোবে।

এমনি সময়ে প্রেতের মত অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীমন্ত সা' এসে হাজির হলো তার টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে।

ইন্দ্রের মুখেচোখে একটা ভয়াবহ অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

শ্রীমন্ত হেসে বলল, "দু'দিন ছিলাম না এখানে, রোহনপুর গিয়েছিলাম কাজের জন্য। এসে শুনলাম কাজ ছেড়ে দিয়েছ তুমি—কেন?"

"আমার দ্বারা হবে না বলে?"

"কি হল আবার?"

ইন্দ্র একবার তাকাল শ্রীমন্ত সা'র মুখের দিকে। মহাজনের তেল চকচকে মুখে একটা নির্দ্দোষ ভাব—যেন সে কিছুই জানে না। একবার ইচ্ছে হল সব বলে, কিন্তু সে থামল। না, সব বলে কথাটাকে আর বাড়িয়ে লাভ নেই।

সে বলল, "সে শুনে আপনার লাভ নেই।"

শ্রীমন্ত একটু চুপ করে রইল, পরে বলল, “আচ্ছা, সে তোমার খুশী। যাক্, আমার একটা কাজ আছে।”

“কি কাজ?”

“বল্‌ছি।”

শ্রীমন্ত ঘোড়া থেকে নামল, জিনের পাশ থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা মরচে-ধরা পুরোনো তলোয়ার নিয়ে এসে ইন্দ্রের হাতে দিয়ে বলল, “জিনিষটা ভাল করে দেখো ত’।”

ইন্দ্র দেখল। লম্বায় দু'হাতেরও বেশী তলোয়ারটা, হাতলটা গজদন্তে মোড়া, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে মণ্ডিত, কিন্তু ভাঙ্গা ও ময়লা। তলোয়ারের পার্শ্বদেশ একটু একটু ক্ষয়ে গেছে, মরচে দেখে বেশ বোঝা যায় যে বহুদিনের পুরোনো জিনিষ। লোহাটাকে ভাল করে পরখ করল ইন্দ্র। ভাল ইস্পাতে তৈরী তলোয়ারটা।

সে বলল, “হুঁ, জিনিষটা খুব ভাল।”

শ্রীমন্ত মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ, গৌড়ের রাজাদের আমলের। জানো ত' ঐ অঞ্চলে কিছু জমি কিনেছিলাম অনেকদিন আগে। জমি সাফ্ করে চাষের উপযোগী করার সময়ে মাটী খুঁড়তে খুঁড়তে একটা ঘরের মত বেরিয়েছিল। কোনও সামন্ত বা ওম্‌রাহের বাড়ী ছিল হয়তঃ সেখানে। সেখানেই এই তলোয়ারটাকে পেয়েছিলাম—বড় পয়া জিনিষটা, কিন্তু জিনিষটা পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাই একে সারিয়ে নিতে চাই। পারবে তুমি?”

একবার ইচ্ছে হল, দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছে হল ইন্দ্রর যে 'না' বলে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেয় লোকটাকে। কিন্তু না, আজ সে অভাবগ্রস্ত, কাজ যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন অবহেলা করবে না সে। আশু বিপদ থেকে ত্রাণ পাওয়া যাবে ত'। আর দু'দিনের ব্যাপার মাত্র। তারপরে সে আর ঐ শয়তানের সাহায্য নেবে না।

"পারব।" ইন্দ্র গম্ভীরভাবে বলল।

"বেশ, এই নাও মজুরী—আগাম দিলাম।" পাঁচটা টাকা সে ইন্দ্রের সামনে রাখল। রেখে আড়নয়নে একবার তাকাল তার মুখের দিকে, একটু হাসিও যেন ঝিলিক মেরে গেল তার তামাকে-পোড়া কালো ঠোঁটের কোণে।

ইন্দ্র টাকা ক'টার দিকে তাকাল, দু'টো টাকা তুলে নিয়ে বলল, "এতেই হবে, আমি দান চাই না।"

শ্রীমন্ত হাসল, "বটে! তা বেশ, বেশ—কবে নাগাদ দেবে ওটা?"

"পরশু দিন।"

"আচ্ছা—" একটু হেসে শ্রীমন্ত বলল, "কিন্তু কামারের পো'র আক্কেল হল কি হে? মহাজনকে ত' বসতে বলল না একবার?"

ইন্দ্র তীব্রদৃষ্টিতে তাকাল শ্রীমন্তের দিকে। মিটিমিটি হাসছে লোকটা।

"না—" ইন্দ্র মাথা নাড়ল, "গরীবের ঘরে মহাজনকে বসতে বলা উচিত নয়, মহাজনের মান যায় তাতে।"

নিঃশব্দে একটু হেসে শ্রীমন্ত সা' ঘোড়ায় চড়ল।

বাগানের মধ্য দিয়ে যে পথটা চলে গেছে সেইদিকে নজর রেখে চলতে চলতে সে বলল, "পরশু আসব।"

চাঁপা থমকে দাঁড়াল।

সামনে ঘোড়ার পিঠে শ্রীমন্ত সা'। দাঁত মেলে হাসছে।

"তোমার জবাব পেয়েছি আমি, কিন্তু শাঁখা সিঁদুরের ভেটটা ফেরৎ পাঠিয়েছি আমি। যা পারব না, তা বলে দেওয়াই ভাল, কি বল?"

চাঁপা স্নান সেরে এসেছে। ছিন্ন, সিক্ত শাড়ীর অন্তরাল থেকে তার স্বগৌর দেহচ্ছটা শ্রীমন্ত সা'র চোখ যেন ঝলসে দিল।

"পথ ছাড়ুন"—চাঁপা বলল।

"পথ ত' আটকে নেই আমি।"

চাঁপা চলতে লাগল।

টাট্টু ঘোড়ার মুখ ফেরাল শ্রীমন্ত সা'।

"চাঁপা—শোন—"

"না, আপনি ভাল চান ত' চলে যান।"

"তা যাচ্ছি, কিন্তু অন্যদিন? শোন চাঁপা, বিস্তর টাকা আছে আমার—যা চাও, পাবে তুমি। সোনা আর গয়নায় তোমার ঐ খালি গা, খালি হাত আমি ভরে দেব। ভেব দেখ, চাঁপা, ভেবে দেখ—"

"ভেবেছি। খবরদার—এখনও যদি পেছু না ছাড়েন আপনি তাতে ভাল হবে না এবার—"

খিলখিল করে হেসে উঠল শ্রীমন্ত সা'। সাপে যদি হাসতে জানত মানুষের মত তবে হয়ত এমনি হাসিই হাসত।

হেসে সে বলল, "এখন থামলাম বটে কিন্তু তোমার পেছু ছাড়তে কোনদিন পারব না কামার-বৌ।"

এগোল না সে আর। যতদূর চাঁপাকে দেখা যায় ততদূর দৃষ্টি প্রসারিত করে টাট্টু ঘোড়ার উপর লাগাম টেনে ঠায় বসে রইল শ্রীমন্ত সা'।

কয়েক দিন বাদে ইন্দ্র কর্ম্মকারের হাতুড়ী আবার কথা বলছে, উনুনের আগুন গন্‌গন্ করছে। প্রাচীনযুগের কোন সামন্তসর্দ্দার বা কোন ওম্‌রাহের অতি-পুরাতন, মরচে-ধরা অথচ গজদন্তখচিত তলোয়ারটা আবার চেহারা বদ্‌লাচ্ছে তার হাতে।

চাঁপা বলল, "বেশ তলোয়ারটা তো—কার ওটা?"

"এই গাঁয়েরই একজনের"—শ্রীমন্ত সা'র নামটা চেপে গেল ইন্দ্র। কি দরকার চাঁপাকে চটিয়ে? সে নিশ্চিন্ত হোক্ এই ভেবে যে দু'দিনের খোরাক জুটেছে।

অনেক রাত অবধি জেগে থেকে তলোয়ারটাকে শান্ দিয়ে সে তার চেহারাটা বদ্‌লে দিল। ঝক্‌ঝক্ করছে তলোয়ারটা, আর কি ধার হয়েছে তাতে। একটা চুল যদি হাওয়ায় উড়ে এসে ওর মুখে পড়ে তবে তাও হয়ত দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে।

খাঁটি ইস্পাতের তলোয়ার। রাতের আব্‌ছা আলোতেও সে তার ভয়াবহ ক্ষমতার কথা যেন জানিয়ে দিল। সে কথা জেনে ইন্দ্র কর্ম্মকারের চোখ দু'টো জ্বলে উঠল একবার।

পরদিন সকালে ইন্দ্র পাশের গাঁয়ে চলে গেল।

দুপুরে ফিরে এসে সে বলল, "ও গাঁয়ের নীলরতন মুখুজ্জের বাড়ী চাল মেরামত করার কাজ পেয়েছি—শিগ্‌গীর খেতে দ্যাও—"

খেয়েই হন্তদন্ত হয়ে সে চলে গেল।

চাঁপাদের খাওয়াদাওয়ার পালা শেষ হতে হতে দুপুর গড়িয়ে গেল অপরাহ্ণের দিকে। জয়া নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমোতে আরম্ভ করল। চাঁপা ঘুমোল না, একটা ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করতে বসল দাওয়ার উপর, ঘরের দরজার সামনে।

ছেঁড়া শাড়ীর পাড় থেকে সুতো বার করছিল সে, হঠাৎ যেন ভূত দেখে চম্‌কে উঠল।

শ্রীমন্ত সা' আশা ছাড়েনি। শেষবারের জন্য চেষ্টা করতে এসেছে—যদি ভালভাবে কাজ হয়।

"আপনার সাহস তো কম নয়!" চাঁপা দাঁতে দাঁত চেপে বলল।

শ্রীমন্ত হেসে দাওয়ার ওপর উঠে দাঁড়াল, "শুধু সাহস নয়, এ আমার দুঃসাহস, তা মানি। কিন্তু উপায় নেই, আমি নিজে ত' আসিনা, তুমিই যে টেনে আন চাঁপা।"

"বেরিয়ে যান এখুনি—এখ্‌খুনি—"

"তা যাব, কিন্তু জবাব ?"

"কিসের ?"

"কি দিলে তোমায় পাওয়া যাবে—কত টাকা, কত গয়না ?"

চাঁপা হাসল, "আপনি টাকা চিনেছেন তাই ভাবেন যে ওতেই বুঝি সব পাওয়া যায়। আমরা গরীব, ওর মর্ম্ম জানি না।"

"তার মানে ?"

"তার মানে—না। আপনি বেরোন এবার—"

"যদি না যাই ?"

"গায়ের হাড়মাংস আপনার আলাদা হয়ে যাবে।"

শ্রীমন্ত মুখ টিপে হাসল, "একটু জল খাওয়াবে চাঁপা, বড্ড তেষ্টা।"

"না।"

"চাতক পাখী হবে মরলে—"

"হই হব—বেরোন এবার। না গেলে আমি আমার ননদকে ডাকব—সে পাশের ঘরেই ঘুমোচ্ছে—"

"ডাক না—সেও তো মেয়েলোক—"

"পাড়ার লোকদের ডাকব চেঁচিয়ে—"

"ডাক।"

চাঁপা উত্তেজনায় কাঁপছিল। ছুটে গিয়ে সে জয়াকে ডাকল, "জয়া, জয়া—ও জয়া—"

"এঁ্যা ?" ধড়মড় করে উঠে বসল জয়া।

"আয়তো—শিগ্‌গীর—"

না, দাওয়ার ওপর কেউ নেই। শ্বাপদের মত নিঃশব্দে অন্তর্হিত হয়েছে শ্রীমন্ত সা'।

"কি হল গো বৌদি—এঁ্যা ?"

"সেই হারামজাদা এসেছিল।"

চোখ ফেটে জলের সঙ্গে রক্ত আর আগুন বেরিয়ে আসতে চায়। আত্মধিক্কারে চাঁপার বুক জ্বলে যায়। রূপ, রূপই তার কাল হয়েছে।

বাড়ী ফিরে রাতের বেলা সব কথা শুনল ইন্দ্র।

চুপ করে বসে রইল সে।

বাইরে তখন রাত গভীর হচ্ছে।

অনেকক্ষণ পরে দেওয়ালে বিলম্বিত শ্রীমন্ত সা'র তলোয়ারটার দিকে ইন্দ্রের নজর পড়ল। ঝক্‌ঝক্ করছে সেটা। তার পুরাতন মহিমাকে সে যেন আবার এতদিনে ফিরে পেয়েছে।

ইন্দ্র বলল, "ভাবিস্ না বৌ, ভয় করিস্ না।"

প্রদীপটাকে নিভিয়ে দিল সে।

পরদিন বিকেলে ইন্দ্র যখন কাজ থেকে ফিরে এল তখন সূর্য্যের আলো নিস্তেজ ও রঙীন হয়ে এসেছে। সন্ধ্যো হলো বলে।

চাঁপা বলল, "জ্বালানি কাঠ এক টুক্‌রোও নেই—তোমায় বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

ইন্দ্র বলল, "কুড়ুলটা এনে দে—কেটে আনি।"

চাঁপা মাথা নাড়ল, "এই সারাদিন খেটে এলে, এখন তোমায় যেতে হবে না, তুমি বোস, আমি আর ঠাকুরঝি কাঠপাতা কুড়িয়ে নিয়ে আসি বাগান থেকে, আজ তাতেই চলে যাবে।"

"আচ্ছা।"

চাঁপা আর জয়া ঝুড়ি নিয়ে বেরোল।

পুরোনো, মজে-যাওয়া পুকুরটার ধারে অনেক শুকনো ডালপাতা পাওয়া যায়। প্রায়ই ওরা সেখান থেকে তা কুড়িয়ে আনে। আজও সেখানে গেল।

দু'জনে দু'দিকে গিয়ে ঝুড়ি বোঝাই করতে লাগল।

চাঁপা ছিল পুকুরটার ভাঙ্গা ঘাটের পাশে। একটা ভাঙ্গা দেওয়ালের স্তূপীকৃত ইঁটের ওপাশে জয়া ছিল। তাকে দেখা যায় না।

"তাড়াতাড়ি কর্‌রে জয়া"—চাঁপা বলল।

"এই হোলো।" জয়ার জবাব শোনা গেল।

এমনি সময়ে অঘটন ঘটলো।

ক্ষুধার্ত্ত বাঘের মত যেন ওৎ পেতে ছিল শ্রীমন্ত সা'।

দৃঢ়মুষ্টিতে চাঁপার ডানহাতের কব্জিটাকে চেপে ধরে শ্রীমন্ত সা' বলল, "এবার ?"

"ছেড়ে দে হারামজাদা—ছেড়ে দে—"

"ছাড়ছি, কিন্তু সে পরে, এখন তো চল আমার সঙ্গে।"

"জয়া—ও জয়া"—প্রাণপণে চীৎকার করে উঠল চাঁপা।

ত্রস্তে চাঁপার মুখ চেপে ধরল শ্রীমন্ত।

"ভালকথার লোক নও তুমি চাঁপা—তাই জোর করতে হল। কি করব—আমি শ্রীমন্ত সা" যা চাই, তা না পেয়ে ছাড়ি না।"

জয়া চাঁপার চীৎকার শুনতে পেয়েছিল। সে এগিয়ে আসতে আসতে চাঁপাব অবস্থা দেখতে পেল।

জয়া চীৎকার করে ডাকল, "বৌদি—বৌ—"

চাঁপা উত্তর দিতে পারল না, শুধু মুক্তি-প্রয়াসে ছটফট্ করতে লাগল।

জয়া আর ডাকল না তাকে। মুহূর্ত্তে উন্মাদিনীর মত শুকনো পাতা দলে, পিষে, চুরমার করে ছুটে গেল বাড়ীর দিকে।

পাঁচ মিনিট পরে গিয়ে সে বাড়ীর কাছে পৌঁছুল।

"দাদা—দাদা"—বিকৃতকণ্ঠে, অতিকষ্টে সে ডাকল।

"কিরে ? কি হয়েছে ? তোর বৌদি কই ?" ইন্দ্র এসে জয়ার অবস্থা দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

"মজা পুকুর-পাড়ে—শ্রীমন্ত সা' বৌদির হাত ধরে টানছে—যাও—যাও"

উত্তর দিল না ইন্দ্র। শুধু ছুটে একবার ভেতরে গেল, দেওয়ালে টাঙ্গানো ঝকঝকে সেই তলোয়ারটা নিয়ে সে উর্দ্ধশ্বাসে বাগানের দিকে দৌড়ে গেল।

তখন সন্ধ্যা হয়েছে।

প্রাণপণ চেষ্টায়, মরিয়া হলে দুর্ব্বল লোকও যেমন শিকল ছিঁড়ে ফেলে তেমনিভাবে শ্রীমন্তের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ভাঙ্গা ঘাটটার দিকে ছুটে গেল চাঁপা। রাগে, ভয়ে আর উত্তেজনায় শরীর তার থরথর করে কাঁপছে, চুল আলুলায়িত, চোখ বিস্ফারিত, নিঃশ্বাস ঘন।

শ্রীমন্ত সা'কেও চেনা যাচ্ছে না। বাজপাখীর ডানার মত কুটিল হয়ে উঠেছে তার ভ্রূ দু'টো। চোখের তারা মদমত্তের মত জ্বলজ্বল্ করছে, নাকটা ফুলে উঠেছে, ললাটে ঘাম চকচক্ করছে।

"চাঁপা শোন—আমার সঙ্গে চল।"

"না"—হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিল চাঁপা।

"আমার সব কিছু তোমার।"

"চাই না"—এক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল চাঁপা।

"ভাল কথায় রাজী হও চাঁপা"—শ্রীমন্ত এগোল।

"রাজী নই আমি।"

"নইলে আজ জোর করে তুলে নিয়ে যাব তোমায়"—শ্রীমন্ত চাঁপার দিকে এগোল।

"পার ত' নিয়ে যাও"—চাঁপার আর ভয় নেই, একটা অদ্ভুত প্রশান্তি এবার থম্‌থম্ করছে তার মুখমণ্ডলে। আরো দু' ধাপ নীচে নামল সে। জল আর মাত্র এক ধাপ নীচে।

শ্রীমন্ত কাঁপছে থরথর করে, "শোন চাঁপা, তুমি যত আমায় বাধা দিচ্ছ

—আমার রক্তে, তোমার চাহিদা ততই বাড়ছে”—আর এক পা এগোল শ্রীমন্ত সা’।

“তোমার কথা আমি আর শুনতে চাই না, উঃ, ভগবান—কেউ কি বাঁচাবে না আমায়?” চাঁপার পা এবার জলে ডুবল।

“তুমি যে নিজেই বাঁচতে চাও না চাঁপা, তুমি চাও জোর—তবে তাই হোক্”—শ্রীমন্ত সা’ চাঁপার দিকে ছুটে গেল। একটা হাত বাড়িয়ে সে তার হাত চেপে ধরতে গেল, কিন্তু পারল না, বাতাসে প্রতিহত হয়ে তার হাতটা আবার ফিরে এল।

জলের মধ্যে অনেক দূরে গিয়ে গলাজলে দাঁড়াল চাঁপা।

“জল দেখে কি ভয় পাই নাকি? মোটেই না।” শ্রীমন্ত বিকৃত হাসি হাসল।

সেও জলের মধ্যে নামল।

ধীরে ধীরে এগোতে লাগল সে চাঁপার দিকে। কুমীর যেমন শিকার লক্ষ্য করে এগোয়।

“আমি তাহলে মরলাম”—চাঁপা বলল। অদ্ভুত একটা দীপ্তিতে তার চোখ দু’টো জ্বলছে—একরাশ পানার মধ্যে পদ্মের মত তার মুখটা ভেসে রয়েছে।

“না—ফিরে এসো—”

“তোমার হাত থেকে বাঁচার আর অন্য পথ নেই যে—আমি আর উঠব না—”

চাঁপা পেছু হটতে লাগল। ক্রমে তার মুখ ডুবল, নাক ডুবল, চোখ ডুবল, মাথা ডুবল। চাঁপা সাঁতার জানে না। সে আর উঠবে না।

গলাজলে গিয়ে শ্রীমন্ত থামল। সেও সাঁতার জানে না। আর মাত্র হাত পাঁচেক দূরে আছে চাঁপা। হয়ত তাকে পাওয়া যাবে। কিন্তু না,

হঠাৎ ভয় হল শ্রীমন্তের। পা ডুবে যাচ্ছে, বহুদিনের অসংস্কৃত মজা পুকুরে স্তরের পর স্তর শুধু কাদা, শুধু কাদা। তাতে প্রতিমুহূর্ত্তে তার পা ডুবে যাচ্ছে, আট্‌কে যাচ্ছে—যেন একটা কুণ্ডলীকৃত অজগজের নাগপাশে সে বন্দী হচ্ছে প্রতি মুহূর্ত্তে। আর বেশীক্ষণ থাকলে নিশ্চিত মৃত্যু।

জল থেকে উঠে সে সিঁড়ির ওপর দাঁড়াল।

কিন্তু চাঁপা ?

"চাঁপা—চাঁপা"—

যেখানটায় চাঁপা ডুবেছে, সেখান থেকে অজস্র বুদ্বুদ উঠে সেখান-কার পানাকে আন্দোলিত করছে। চাঁপা মরছে।

"চাঁপা"—ফিস্ ফিস্ করে ডাকল শ্রীমন্ত সা'। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সেই নির্জ্জন, অন্ধকার পরিবেশের মধ্যে নিজের কণ্ঠস্বরকে নিজের কাছেই অত্যন্ত ভয়াবহ ও অস্বাভাবিক মনে হল তার। একটা ঢিল তুলে নিয়ে সেই বুদ্বুদরাশি লক্ষ্য করে সে ছুঁড়ে মারল। টুক্ করে একটা শব্দ হল শুধু। একটা বৃত্তাকার তরঙ্গ সৃষ্ট হয়ে পরমুহূর্ত্তেই তা অজস্র পানাতে আট্‌কে মিলিয়ে গেল।

"চাঁপা"—মুখ ফুটে আবার ডাকতে গেল সে। আওয়াজ বেরোল না তার গলা থেকে।

চাঁপা মরেছে। সে-ই দায়ী এ মৃত্যুর জন্য! শুধু দায়ী নয়, সে খুনী! হঠাৎ এতক্ষণে, এক মুহূর্ত্তে শ্রীমন্ত সা' সম্বিৎ ফিরে পেল, সুস্থ হল। পালাতে চাইল সে উর্দ্ধশ্বাসে। কিন্তু পা সরল না। সেই সিঁড়ির ধাপের ওপর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে সে জলের ওপর তাকিয়ে রইল সম্মোহিতের মত। বুদ্বুদ কমে এসেছে।

কার দ্রুত পদশব্দ!

পেছন ফিরে তাকাবার ক্ষমতাও নেই শ্রীমন্তের।

"শ্রীমন্ত সা'—" কর্কশ গর্জ্জন করে ইন্দ্র কর্ম্মকার এসে সামনে দাঁড়াল।

হাতে তার সেই মাটী-খুঁড়ে-পাওয়া, মরচে-ধরা তলোয়ারটা, এখন তা ঝক্-ঝক্ করছে রূপোর মত।

শ্রীমন্ত নিরুত্তরে তাকাল ইন্দ্রের মুখের দিকে। তার চোখে ত্রাস।

"চাঁপা কই—চাঁপা?" অবরুদ্ধ আক্রোশে ইন্দ্র কর্ম্মকারের মুখমণ্ডল কালো পাথরের মত কঠিন দেখাচ্ছে—চোখের তারা দু'টো তার অগ্নিদগ্ধ লোহার মত টক্‌টকে লাল।

শ্রীমন্ত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে জলের দিকে দেখাল—যেখানে চাঁপা ডুবেছে।

জল শান্ত, আলোড়নহীন। পানাগুলো আবার জমাট বেঁধে জলকে ঢেকে ফেলেছে।

"মরে গেছে?" ইন্দ্র প্রশ্ন করল।

শ্রীমন্ত সভয়ে মাথা নাড়ল। মাথা নেড়েই হঠাৎ পালাবার চেষ্টা করল সে। অকস্মাৎ দেহে যেন তার শক্তি ফিরে এল, বাঁচবার জন্য মরিয়া হয়ে দৌড়োতে চাইল সে।

কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে।

শ্রীমন্ত সা'র মাথার চুল ধরে ইন্দ্র কর্ম্মকার টেনে দাঁড় করাল। এত জোরে সে টান দিল যে মাথার অনেক চুল উপড়ে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল।

"আমাকে মেরোনা—আমাকে মেরোনা—যা চাও তাই দেব আমি"—সন্ত্রাসে, কাঁপতে কাঁপতে, শ্রীমন্ত সা' তার অন্তিম আবেদন জানাল। ভয়ার্ত্ত কান্নায় তার কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে পড়ল, চোখে ফুটে উঠল একটা আতঙ্ক-বিহ্বল চাহনি।

ইন্দ্র কর্ম্মকার হাসল। অতি কর্কশ ও বিকট সে হাসি। ক্ষুধার্ত্ত হায়েনার মত।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত্ত।

তারি মধ্যে, সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে, সেই প্রাচীন যুগের মাটী-খুঁড়ে-পাওয়া গজদন্তখচিত তলোয়ারটা দিয়ে সে শ্রীমন্ত সা'কে কুচি কুচি করে কাটল। চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোগ করে, বহু মানুষকে বঞ্চিত করে, পরের রক্ত শোষণ করে করে যে শ্রীমন্ত সা' তার দেহটিকে রক্তস্ফীত জোঁকের মত শাঁসালো করে তুলেছিল তারি দেহের উষ্ণ ও জমাট রক্তের একটা ধারা গিয়ে পুকুরের জলে নামল।

নিস্তরঙ্গ বায়ুস্তরে যেন একটা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। লালসাতুর শ্রীমন্ত সা'র যে দেহটা খণ্ডীকৃত হয়ে পায়ের কাছে পড়ে আছে তারি রক্তের একটা উষ্ণ ও তীব্র গন্ধ যেন ইন্দ্র পাচ্ছে—আঃ—আঃ—। ক্রম-বর্দ্ধমান অন্ধকারের মধ্যে, সেই রক্ত-রঞ্জিত তলোয়ারটাকে হাতে নিয়ে, অন্ধকারে অস্পষ্ট ও আলোড়নহীন মজা পুকুরটার দিকে রক্তস্নাত ইন্দ্র তার দু'টো চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। যেন সে অপেক্ষা করছে। যেন এখুনি কেউ ডাকবে, এখুনি কেউ জমাট পানার যবনিকা সরিয়ে ওপরে উঠে আসবে, এসেই তাব বিদ্যুল্লতার মত মাদকতাময় দেহটাকে যেন ইন্দ্রের বুকে এলিয়ে দেবে, তার পদ্মের মত মুখটা তুলে ধরবে ইন্দ্রের মুখের কাছে আর তৃষ্ণার্ত্ত ঠোঁট দু'টোকে এগিয়ে দেবে অধীর আগ্রহে—একটা দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনের জন্য।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত্ত। কিন্তু না, কেউ ডাকল না, জমাট পানার যবনিকা সরিয়ে কেউ উঠে এল না। ইন্দ্র কর্ম্মকার একটা তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ করে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আলোড়িত ভারী জলের শব্দ ভেদ করে আর একটা শব্দ উত্থিত হল। বহু পুরাতন মজা পুকুরটার ফাটলধরা ঘাটের একটা ধাপের ওপর অতীত যুগের সেই গজদন্তখচিত তলোয়ারটা ঝন্‌ঝন্ শব্দে আছড়ে পড়ল।